রাণী রাসমণি।

(জীবন-চরিত)

শ্রীপ্রবোধচন্দ্র সাঁতরা কর্ত্তৃক সঙ্কলিত।



RANI RASHMANI

BY

Prabodh Chandra Santra.

প্রথম সংস্করণ।

কলিকাতা, ইটালী

৩৮ নং পুলিশ হাসপাতাল রোড হইতে

শ্রীনরেন্দ্রনাথ দাস কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

১৩২০ বঙ্গাব্দ।



মূল্য ॥০ আট আনা মাত্র।

ললিত প্রেস।
২৫।১এ মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা,
শ্রীললিতমোহন রায় দ্বারা মুদ্রিত।



উৎসর্গ-পত্র।



যিনি আমার ইহ জগতের আরাধ্য দেবতা,

গৃহী হইয়াও যিনি সংসার-বিরাগী,

জীবনে মরণে যাঁহার ঋণ

অপরিশোধনীয়,

সেই পিতৃদেবের শ্রীচরণে

এই গ্রন্থ

ভক্তি সহকারে

উৎসর্গীকৃত হইল।



প্রণত প্রবোধ।

প্রবেদন।



আমাদের ভারতবর্ষ স্বতঃই রত্নপ্রসবিণী। ইহাতে একদিকে যেমন হীরক, স্বর্ণ, রৌপ্য, লৌহ, তাম্র, অভ্র ইত্যাদি ধাতু সকল উৎপন্ন হইতেছে, অন্যদিকে তেমনই বীর-সন্তান, বীরাঙ্গনা, দানশীলা, পুণ্যবতী, বিদুষী রমণী সকলে ধরা শোভিতা হইতেছে। একদিকে যেমন, বীরপুরুষ, জন্মিয়াছেন; অন্য দিকে তেমনি ধার্ম্মিক, পণ্ডিত, দাতা জন্মিয়া দেশেব উপকার করিয়াছেন। সুদূর পাশ্চাত্য প্রদেশের কথা ছাড়িয়া দিলেও এক ভারতবর্ষে একদিকে যেমন রামচন্দ্র, যুধিষ্ঠির, অর্জ্জুন, ভীষ্ম, সুযোধন, রাণাপ্রতাপ, প্রতাপাদিত্য, ভীমসিংহ, বাদল, ঝান্সীর রাণী পদ্মিনী প্রভৃতি বীরগণ জন্মিয়াছেন, অন্যদিকে তেমনই কালিদাস, ভবভূতি, মাঘ, ভারবী, ভট্ট, খনা, লীলাবতী, উভয় ভারতী, গার্গী, পণ্ডিতা রমাবাই, বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্র, হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র জন্মিয়া ধরা উজ্জ্বল করিয়াছেন। একদিকে যেমন দাতাকর্ণ, তাম্রলিপ্তের ময়ূরধ্বজ, তাম্রধ্বজ, ময়নার বাহুবলীন্দ্র, উৎকলে অনঙ্গভীম, কর্ণাটের ভূপাল কাশীরাজ প্রভৃতি দানবীর সকল জন্মিয়াছেন, অন্য দিকে তেমনই, রাণী ভবানী, রাণী স্বর্ণময়ী, রাণী ভগবৎসুন্দরী, রাণী হেমন্তকুমারি, রাণী রাসমণি প্রভৃতি দানশীলা রমণীগণ জন্মিয়াছেন।

জগতের ইতিহাসে যে সকল মহাত্মাদের ও পুণ্যবতী রমণীদের জীবনী রহিয়াছে তাহা পাঠে জানা যায় যে, যখনই ধরায় কোন বিষয়ে অভাব হইয়াছে, তখনই সর্ব্বনিয়ন্তা কোন রমণী বা পুরুষের আবির্ভাব করাইয়া

ধরার অভাব পূরণ করতঃ তাঁহার কার্য্য সাধন করিয়াছেন। কার্য্য তাঁহার, তিনিই করান, মানব উপলক্ষ মাত্র। যখনই ধরা পাপের ভার, প্রবলের অত্যাচার ও দস্যু-তস্করের উপদ্রবে উৎপীড়িত, ব্যথিত, মথিত, হইয়াছে; তখনই কোন বংশে কোন পুরুষ বা স্ত্রী আসিয়া তাহার শান্তি বিধান করিয়াছেন। দুর্ভিক্ষের প্রকোপ, জলপ্লাবন যুদ্ধ-বিগ্রহের সূচনা, অরাজকতার আবির্ভাব সকল সময়ে প্রয়োজন মত করুণাময়ের ইচ্ছায় হইয়াছে ও তাঁহারই ইচ্ছায় শান্তি হইয়াছে।

পূর্ব্ব বঙ্গে যখন রাণী ভবানীর মত কোন রমণীর প্রয়োজন হইয়াছিল, ভগবান তখনই তাঁহাকে সৃজন করিয়াছেন, আবার সন্তানসন্ততি থাকিলে হয়ত ধর্ম্ম কার্য্যের ব্যাঘাত হইবে, সেই জন্যই বোধ হয় পতি-পুত্র কাড়িয়া লইয়া তাঁহাকে দেশের কার্য্যের জন্য অবাধে মুক্তপ্রাণে, দান কার্য্যের সহায়তা করিয়াছেন।

দক্ষিণ বঙ্গে যখন রাণী রাসমণির মত কোন পুণ্যবতী দানশীলা রমণীর প্রয়োজন হইয়াছিল, তখনই ঈশ্বর তাঁহাকে দরিদ্রের গৃহে পুত্রহীনা ও বিধবা করিয়া দশের উপকার, দেশের উপকার জন্য সৃজন করিয়াছিলেন।

রাণী রাসমণি দরিদ্রের পর্ণকুটীরে জন্ম গ্রহণ করিয়াও অতুল বৈভবের অধিকারিণী হইয়াছিলেন, তিনি রাজপত্নী না হইয়াও 'রাণী' বলিয়া পরিচিতা। রাণী ভবানী জমিদারের কন্যা ও রাজপত্নী এবং অর্দ্ধবঙ্গেশ্বরী ছিলেন; তিনি রাজ্যেশ্বরী মহারাণী। সুতরাং রাণী ভবানীর সহিত রাণী রাসমণির দান-যজ্ঞের তুলনা হইতে পারে না। তথাপি আমরা উভয়ের মহত্ব এক শ্রেণীর বলিয়া বিবেচনা করিতে পারি না কি? উভয়েই ধর্ম্মশীলা পতিপুত্রহীনা আর্য্য বিধবা; একই উদ্দেশ্যে উভয়ের মন প্রাণ নিয়োজিত—দশের জন্য, দেশের জন্য, ধর্ম্মের জন্য, পুণ্যকার্য্যে,

দানযজ্ঞে উভয়েই অজস্র অর্থ জলস্রোতের ন্যায় ব্যয় করিয়াছিলেন; উভয়েই আদর্শ বঙ্গ-মহিলা।

আদর্শ নরনারীর জীবনী পাঠে উপকার দর্শে—মানবের নৈতিক চরিত্র গঠনের সহায়তা করে। তাই সভ্য দেশ মাত্রেই জীবনী গ্রন্থ লিখিত হইয়া থাকে। বর্ত্তমান গ্রন্থ খানিও সেই আশায় সঙ্কলিত হইল।

এই আদর্শ বঙ্গ-মহিলা রাণীর চরিতাখ্যান সংগ্রহকল্পে আমার পূজ্যপাদ পিতৃঠাকুর ও খুল্লপিতামহ (প্রবীণ শ্রীযুক্ত দয়ালচাঁদ সাঁতরা মহাশয়) আমাকে বিশেষরূপে সাহায্য করিয়াছেন। আশৈশব যাঁহাদের স্নেহছায়ায় লালিতপালিত ও বর্দ্ধিত হইয়াছি, তাঁহাদের ঋণ যে অপরিশোধনীয়!—কৃতজ্ঞতার কথা বাহুল্য মাত্র! পূজনীয় শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, 'তমলুকের ইতিহাস'-প্রণেতা শ্রীযুক্ত সেবানন্দ ভারতী, সুনামগঞ্জের উকীল শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার রায় এম এ, বি এল ও কলিকাতা ভবানীপুরনিবাসী শ্রীযুক্ত কালীপদ দাস বি এ প্রভৃতি মহাশয়গণের নিকটও অনেক সাহায্য প্রাপ্ত হইয়াছি—ইঁহাদের নিকটও অচ্ছেদ্য কৃতজ্ঞতা শৃঙ্খলে আবদ্ধ হইলাম। পরিশেষে কলিকাতা ইটালী নিবাসী শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ দাস মহাশয়ের নিকট আমার হৃদয়ের গভীরতর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছি, তিনি ইহার মুদ্রণ-কার্য্যের ব্যয় ভার বহন না করিলে এই গ্রন্থ লোক-লোচনের গোচরীভূত হইত কি না সন্দেহ।

উপন্যাস ও জীবন-চরিতে পার্থক্য আছে। উপন্যাস পাঠে পাঠকের মনে যেমন আহ্লাদের উদ্রেক হয়, জীবন-চরিত পাঠে তেমন হয় না বটে, কিন্তু তাহাতে জাতীয় চরিত্রের উৎকর্ষ সাধিত হয়। এই চরিতাখ্যান পাঠে যদি একজনেরও কিছু উপকার দর্শে, তাহা হইলে আমার পরিশ্রম সফল জ্ঞান করিব।

পরিশেষে বক্তব্য এই যে, সময়াভাব, অর্থাভাব ও তদপেক্ষা মদীয়

যোগ্যতার অধিকতর অভাবে এই গ্রন্থ খানিকে তেমন মনের মত করিয়া তুলিতে পারি নাই। ইহাতে ভাষার পারিপাট্য তেমন হয় নাই। মুদ্রণ কার্য্যেরও বিশেষ প্রমাদ পরিলক্ষিত হইবে। নানা কার্য্যে ব্যাপৃত থাকায় মনোযোগের সহিত প্রুফ দেখা হয় নাই বলিয়া স্থানে স্থানে ভুলভ্রান্তি রহিয়া গিয়াছে। তজ্জন্য আমি সাধারণের নিকট মার্জ্জনার ভিখারী রহিলাম। এই বারে যে সমস্ত ভ্রমপ্রমাদ ও অসঙ্গতি পরিলক্ষিত হইবে, পাঠকগণ দয়া করিয়া, ৩৮ নং পুলিশ হাসপাতাল রোড ইটালী কলিকাতা এই ঠিকানায় প্রকাশকের নিকট লিখিয়া পাঠাইলে পরবর্ত্তী সংস্করণে তাহা সংশোধন করিয়া লওয়া যাইবে এবং গ্রন্থকার তজ্জন্য তাঁহাদের নিকট চিরবাধিত হইবেন।

বিনীত

শ্রীপ্রবোধচন্দ্র সাঁতরা।

শ্রাবণ
১৩২০

সূচীপত্র ।

(পার্শ্বস্থ সংখ্যাগুলি পত্রাঙ্ক-জ্ঞাপক)

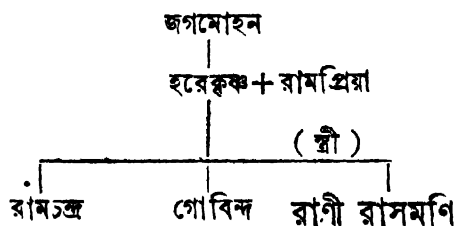
প্রথম খণ্ড ।

দ্বিতীয় খণ্ড ।

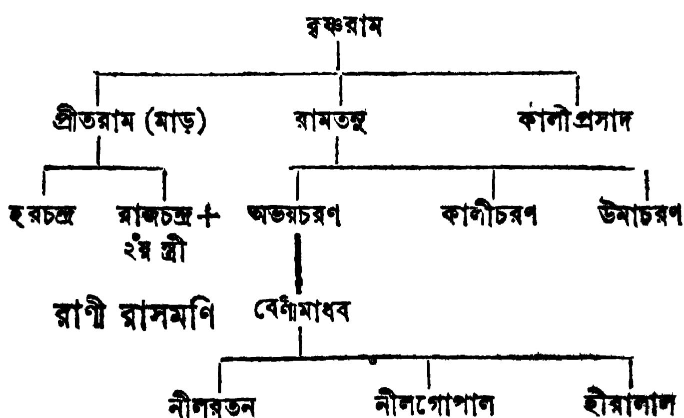
তৃতীয় খণ্ড।

বংশলতা।

১। রাণী রাসমণির পিতৃবংশ।



২। রাণী রাসমণির শ্বশুর বংশ।



রাণী রাসমণি।

প্রথম খণ্ড।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

জন্ম—বংশানুচরিত—বাল্যজীবন।

কলিকাতার উত্তরে গঙ্গার পূর্ব্বতীরবর্ত্তী হালিসহরের নিকট কোণা নামে একটী গণ্ড গ্রাম আছে। পূর্ব্বে কাঞ্চনপল্লীর "বাঘের খাল" হইতে ইছাপুর-নবাবগঞ্জের খাল পর্য্যন্ত হালিসহর 'হাবেলি সহর' পরগণা নামে খ্যাত ছিল, পরে উহা ২৪ পরগণার অন্তর্ভুক্ত হইয়া যায়। এই কোণা গ্রামের একটি দরিদ্র মাহিষ্য বংশে বঙ্গাব্দ ১২০০ সালে ১১ই আশ্বিন বুধবার প্রাতঃকালে পিতা হরেকৃষ্ণ দাসের ঔরষে ও মাতা রামপ্রিয়া [redacted] গর্ভে প্রাতঃস্মরণীয়া পুণ্যবতী রাণী রাসমণি জন্ম গ্রহণ করেন। গ্রাম্য ধাত্রী নিয়োজিত থাকা সত্ত্বেও প্রসবে বিলম্ব হইতেছিল, রাণীর পিতা ধর্ম্মপরায়ণ হরেকৃষ্ণ দাস ব্যাকুল হৃদয়ে দেবতার করুণা প্রার্থনা করিতেছিলেন, এমন সময়ে রাণীর পিতৃ-স্বসা ক্ষেমঙ্করী আনন্দ সংবাদ জ্ঞাপন করিলেন যে, একটী কন্যা সন্তান হইয়াছে। তখনই হরেকৃষ্ণ দাস প্রতিবেশীর পুত্র কন্যাগণকে ডাকিয়া দেবোদ্দেশে

নবজাত কন্যার শুভ কামনায় "হরি-লুট" দেন। হরেকৃষ্ণ দাসের দুইটী পুত্র সন্তান হইয়া বহুদিন যাবৎ আর কোন সন্তানাদি হয় নাই। বহুদিন পরে কন্যা সন্তান হওয়ায় তাঁহারা বিশেষ উৎফুল্ল হইলেন। পুত্র দুইটীর নাম রামচন্দ্র ও গোবিন্দ। রামচন্দ্র বড়, গোবিন্দ ছোট। রামপ্রিয়া রাণীর ১॥ বৎসর বয়ঃক্রম কালেই কন্যাকে 'রাণী' বলিয়া ডাকিতেন, পরে রাসমণি নামকরণ হয়। বোধ হয়, ভবিষ্যতে রাণীর ন্যায় ঐশ্বর্য্য ভোগ করিতে হইবে বলিয়াই ভবিষ্যদ্বাণীর মত মাতৃমুখে রাণী নাম সূচিত হইয়াছিল। সেই অবধি প্রতিবেশীরাও 'রাণী রাসমণি' বলিত। আমরাও রাণী রাসমণিকে রাণী নামেই অভিহিত করিতে থাকিব।

রাণী রাসমনি দরিদ্রের কন্যা। দরিদ্রের কন্যার নাম রাণী ও অন্ধ-পুত্রের নাম পদ্মলোচন বড়ই অসামঞ্জস্য উপমা সন্দেহ নাই। রাণী জন্মকালে সোণার ঝিণুক, রূপার চামচ বা মোহরের থলি লইয়া জন্মগ্রহণ করেন নাই বটে, কিন্তু তাঁহার ধন ও যশোভাগ্য ছিল এবং লগ্ন-চক্র যে বিশেষ শুভ ছিল সে কথা বলাই বাহুল্য। হরেকৃষ্ণ দাস (হারু ঘরামী) কোন প্রকারে জাতীয় বৃত্তি কৃষি কার্য্যাদি ও গৃহনির্ম্মাণাদি শিল্প কার্য্য দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেন। তাঁহার বাটীতে ৪ খানি মাত্র মৃৎ-রচিত তৃণাচ্ছাদিত গৃহ ছিল। হরেকৃষ্ণ দাসের পিতা জগমোহন দাসও দরিদ্র ছিলেন। তিনিও বিশেষ কিছু সম্পত্তি রাখিয়া যাইতে পারেন নাই। ঐ ৪ খানি ঘরের মধ্যে ২ খানি শয়নাগার, ১ খানি রন্ধনশালা ও ভাণ্ডারগৃহ, ও অন্যখানি গোশালা, তাহাতে একটী সবৎসা গাভী। বাহিরে একটী বসিবার দাওয়া। পার্শ্বে দক্ষিণ দিকে বাগান ও পুষ্করিণী। বাগানে কয়েকটী ফলের ও ফুলের গাছ। কয়েক বিঘা মাত্র ধান্য ক্ষেত্রের উপস্বত্ব, তাহাতেই এই ৬টী প্রাণীর গ্রাসাচ্ছাদন হইত।

তৎকালে তেমন শিক্ষার বিস্তার না থাকিলেও হরেকৃষ্ণ দাস কিছু বাঙ্গলা লেখা পড়া জানিতেন। তিনি সহৃদয়, ধার্ম্মিক ও পরোপকারী ছিলেন। তিনি বিবাদে সর্ব্বপশ্চাতে, বিপদে সর্ব্বাগ্রে থাকিতেন। স্ত্রী রামপ্রিয়াও স্বামীর ন্যায় ধর্ম্মপরায়ণা ছিলেন, দেব দ্বিজে তাঁহাদের প্রগাঢ় ভক্তি ছিল।

এই কৃষ্ণ-ভক্তি-পরায়ণ দম্পতি যখন কোশাকোশী লইয়া সন্ধ্যাবন্দনাদি ও তিলক ধারণ করিতেন, রাণীও পিতামাতার সমীপস্থা হইয়া দর্পণে মুখ দর্শন, তিলক ধারণ প্রভৃতি পূজা পদ্ধতির অনুকরণ করিতেন। বাল্যকালে ধর্ম্মাচরণের অনুকরণ-প্রিয়তা তাঁহার হৃদয়ে যে ধর্ম্মবীজ রোপণ করিয়াছিল তাহা ভবিষ্যতে পুণ্যময় জীবনের নিয়ামক হইয়াছিল। পিতা মাতার গুণ পুত্রকন্যায় বর্ত্তে। গৃহকর্ম্ম ও অন্যান্য বিষয়েও রামপ্রিয়া কন্যাকে শিক্ষা দিতেন।

হরেকৃষ্ণ দাসের বাটীতে রাত্রিতে কৃত্তিবাসী রামায়ণ, কাশীদাসের মহাভারত ও ঐ রূপ বাঙ্গলা পুরাণাদি নিয়মিত পঠিত হইত। প্রতিবেশী অনেকেই শুনিতে আসিত। তখনকার দিনে হালিসহর অঞ্চলে এইজন্য হরেকৃষ্ণ দাসের নাম খ্যাত ছিল।

রাণী শৈশবাবস্থায় সহচরীগণের সহিত ধূলা খেলা করিতেন। বাটীর সংলগ্ন বাগানেই তাঁহাদের খেলার স্থান ছিল, খেলার মধ্যে প্রধান খেলা দোলনায় দোল খাওয়া। একটি আম গাছের ডালে দড়ি দিয়া ঝুলনা করা ছিল, পর্য্যায়ক্রমে সকলেই দোল খাইতেন। একদিন বৈশাখের দ্বিপ্রহরে রাণী দোল খাইয়া, একটি বহু প্রাচীন ডুমুর গাছের তলে বিশ্রাম করিতে বসিলে, দেখিতে পাইলেন যে, একটি ডুমুরের গুচ্ছ মধ্যে একটি ফুল ফুটিয়া রহিয়াছে। রাণীর শুনা ছিল যে ডুমুরের ফুল দেখা যায় না, যদি কেহ দেখে সে পৃথিবীতে ধনী ও সুখী হয়। রাণী সহচরীদের নিকট বলিলে কেহই

বিশ্বাস করিল না, দেখাইতে গেলে তাহা আর দেখা গেল না; বিলীন হইয়া গিয়াছে। হয় ত যাহার জন্য ফুটিয়াছিল সেই মাত্র দেখিয়াছিল, অন্যে দেখিবে কেন? রাণীর মাতা শুনিয়া বলিলেন, "মা তুমি আমার রাজরাণী হবে।" এ উক্তি যে কালে সত্য হইয়াছিল তাহার আর সন্দেহ নাই। উত্তর কালে রাণী নিজ মুখে এই কথা অনেককে বলিতেন।

আমি স্বয়ং কখনও পিপড়ের রা, সাপের পা, ডুমুরের ফুল, সাপের মাথার মাণিক কি গজমুক্তা দেখি নাই বা স্বাতী নক্ষত্রের জলবিন্দুও আমার মাথায় পড়ে নাই, অথবা এই সকলের তাৎপর্য্যই বা কি তাহা বুঝি না। এ জগতে অসম্ভবও সম্ভব হইতে দেখা যায়। যদি ইহা সম্ভব ও সত্য হয় যে; পুঠিয়ার রাজবাটীতে পূজারী ব্রাহ্মণ অবস্থায় নাটোর রাজবংশের আদিপুরুষ বৃক্ষতলে দিবাভাগে নিদ্রিত ছিলেন, সৌরকর মুখে পড়িতেছিল, কোথা হইতে কালসর্প ফণা বিস্তার করিয়া নিদ্রার ব্যাঘাত হইতে সূর্য্যকিরণ রোধ করিয়াছিল এবং তিনি ইহার ফলে যখন রাজা হইয়াছিলেন, তখন রাণীর পক্ষেই বা ডুমুরের ফুল দর্শন অসম্ভব হইবে কেন?)

রাণী ক্রমে ক্রমে সপ্তম বৎসরে পদার্পণ করিলেন। এই সময়ে একটি বড় শোচনীয় ঘটনা ঘটিল। কাল অদৃষ্টে নিষ্ঠুর হাসি হাসিল। মঙ্গলময়ের ইচ্ছায় রামপ্রিয়া অষ্টাহ কালব্যাপী জ্বর বিকার রোগে ইহলোক ত্যাগ করিলেন। রাণী কাঁদিয়া আকুলা হইলেন, কত লোকে কত বুঝাইল, সকলেই স্তোক দিতে লাগিল, "তোমার মাতা কাল আসিবে"। কিন্তু হায়! কালে এমন কোন 'কাল' আসিল না; যে কালে রাণীর স্নেহময়ী মাতা ডাগর ডাগর কাল কাল দুইটী চক্ষু ও একখানি ভালবাসা-মাখা মুখ লইয়া রাণীকে সান্ত্বনা দিতে আসিল। সময় বড় সুচিকিৎসক। ক্রমে সময়ের গুণে রাণী

মাতৃ-শোক হইতে অল্পে অল্পে প্রকৃতিস্থা হইলেন। ক্রমে রাণী একাদশে পদার্পণ করিলেন।

হরেকৃষ্ণ দাস পত্নীবিয়োগ জনিত ব্যথা সত্বেও তিনটী পুত্রকন্যা ও ভগিনী ক্ষেমঙ্করীকে লইয়া কষ্টে দিনাতিপাত করিতেছিলেন, এখন রাণী বয়স্থা হইতেছেন দেখিয়া পাত্রস্থা করিতে ব্যস্ত হইলেন। রাণীর জন্মের ষষ্ঠ দিনে বিধাতা পুরুষ অলক্ষ্যে রাণীব অদৃষ্টে যাহা লিখিয়াছিলেন তাহা সফল হইতে চলিল। রাণীর ভাগ্যচক্র সময়রূপ আবর্ত্তনে ঘুরিয়া কোন ভাগ্যবান পুরুষের অদৃষ্টের সহিত সংযোগ করিয়া দিল। পর পর পবিচ্ছেদে তাহা প্রকাশ করিতে প্রয়াস পাইয়াছি। এই সময়ে রাণীর বর্ণ সুগৌর, দেহ নাতিস্থূল নাতিকৃশ, কৃষ্ণ কেশগুচ্ছ নিতম্ব চুম্বিত হইয়া তাঁহাকে সুন্দরী স্ত্রী জনোচিত শোভায় শোভিত করিতেছিল। এই সময়ে যে রাণীকে দেখিত, সুন্দরী না বলিলেও সুলক্ষণা বলিত।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।



জানবাজার জমিদার-বংশের পূর্ব্ব বিবরণ।

রাণীর বিবাহ।

অষ্টাদশ শতাব্দীর বিষম রাষ্ট্রবিপ্লব কালে—বর্গীর হাঙ্গামায় ভীষণ দুর্দ্দিনে—প্রীতরাম দাস, পিতৃমাতৃহীন অবস্থায় দুইটী কনিষ্ঠ ভ্রাতা রামতনু ও কালী প্রসাদকে লইয়া, জানবাজারের মান্না বাবুদের বাটীতে লালিত পালিত হইতেন। প্রীতরাম দাসের পিতার নাম কৃষ্ণরাম দাস। হাওড়া জেলার অন্তর্গত খোষালপুর গ্রামে তাঁহার বাসস্থান ছিল। এই প্রীতরাম বাবুই কলিকাতা জানবাজারস্থ মাহিষ্য জমিদার বংশের বিত্তার্জ্জনকারী আদি পুরুষ। ইনি মান্না বাবুদের বাটীতে পিতৃস্বসা বিন্দুবালার নিকটে থাকিয়া বাবু যুগল কিশোর মান্না ও বাবু অক্রুরচন্দ্র মান্না দুই ভ্রাতার স্নেহছায়ায় বর্দ্ধিত হইতেছিলেন। এই মান্না-বংশ অতি প্রাচীন বংশ। ইহাদের বাস গড়গোবিন্দপুর নামক স্থানে ছিল। এখন যেখানে রাজধানী দুর্গ (Fort William) রহিয়াছে, ঐ স্থানেই পূর্ব্বে মান্না বাবুদের বাটী ছিল। পূর্ব্বে ইহাদের বিশেষ প্রতাপ ছিল ও বহু ভূসম্পত্তি ছিল। বিন্দুবালার স্নেহে ও মান্নাবাবুদের যত্নে ও তত্ত্বাবধানে প্রীতরাম ঐ বাটীর তৎকালীন পাঠশালায় পাঠাভ্যাস করেন। অক্রুর চন্দ্র মান্না মহাশয় তখন ডনকিন সাহেবের দেওয়ান ছিলেন। উক্ত সাহেবের বেলিয়াঘাটায় লবণের কারবার ছিল, তাহাতে তিনি প্রীতরাম বাবুকে সামান্য বেতনে মুহুরির কার্য্যে নিযুক্ত করিয়া দেন। বিশেষ মেধা ও তীক্ষ্ণ বুদ্ধি থাকাতে

লবণের কারবারে বাঁটা ও উপরি আয় হওয়াতে অল্প দিনে তিনি বহু অর্থ উপার্জ্জন করেন। পরে সাহেব গত হইলে কারবার বন্ধ হইয়া যায়, প্রীতরাম বাবু তখন পূর্ব্ব দেশীয় কোন বঙ্গজ বংশ দণ্ডের মহাজনের সহিত মিলিত হইয়া বেলিয়াঘাটায় বাঁশের আড়ত স্থাপন করেন। তাহাতেই "মাড়" উপাধি সহ প্রচুর অর্থাগম হয়। বংশের ব্যবসা সত্ত্বেও তিনি টালার নিলাম হইতে দ্রব্যাদি খরিদ করিয়া আনিয়া সাহেবদের নিকট দ্বিগুণ চতুর্গুণ মূল্যে বিক্রয় করিতে লাগিলেন। ক্রমে রসদ যোগানের ভার লইলেন। তাহাতেও বেশ অর্থাগম হইতে লাগিল।

এমন সময়ে যশোহরের ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব কার্য্যোপলক্ষে কলিকাতায় আসিয়া মান্নাবাবুদের ভাড়াটীয়া বাটীতে স্বল্পকালের জন্য বাস করিতেছিলেন। কার্য্যব্যপদেশে যুগল কিশোর মান্না মহাশয় প্রীতরাম বাবুকে সঙ্গে লইয়া সাহেবের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ করার পর প্রীতরাম বাবুর একটি চাকুরির জন্য বলেন। প্রিয়দর্শন, মেধাবী ও কার্য্যকুশল প্রীতরামকে সাহেব সঙ্গে লইতে চাহিলেন। প্রীতরামেরও একান্ত ইচ্ছা যে, স্বোপার্জ্জিত অর্থে দশের মধ্যে দেশের মধ্যে একজন মানুষের মত হইব। যখন প্রবাদ ছিল, সাহেব ছুঁইলে চাকুরী পাওয়া যায়, উইল করিলে লোক মরিয়া যায়; স্ত্রীলোক লেখা পড়া শিখিলে বিধবা হয়, তখন অষ্টাদশ বৎসর বয়সে প্রীতরাম একাকী সাহসে ও অদৃষ্টে নির্ভর করিয়া সাহেবের সঙ্গে যশোহরে চলিলেন। তথা হইতে ঢাকায় কিছুদিন চাকরী করিয়াছিলেন। নাটোরের তদানীন্তন রাজা রামকান্ত রায়ের সঙ্গে পরিচিত হইলে, তিনি সচ্চরিত্রতা কার্য্যকুশলতা ও বুদ্ধিমত্তা দেখিয়া তাঁহাকে আপন ষ্টেটের দেওয়ান পদে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। কিছু দিন এই পদে সুখ্যাতির সহিত কার্য্য করিয়া কলিকাতায় আসেন। কিছুদিন পরে, সাতোর পরগণা ও মকিমপুর তালুক নীলামের লাটে উঠিলে, সাতোর পরগণার নায়েব

শিবরাম সান্ন্যাল ও প্রীতরাম বাবু উভয়ে পরামর্শ করিয়া, প্রীতরাম বাবুর নামেই উক্ত পরগণা দুইটী খরিদ করিয়া রাখেন। পরে শিবরাম সান্ন্যাল সাতোর পরগণা নিজে রাখিয়া জলগণ্ড, অনুর্ব্বর, অসমতল, মকিমপুর পরগণা প্রীতরাম বাবুকে ১৯ হাজার টাকায় ছাড়িয়া দেন। এই সময়ে প্রীতরাম বাবু জানবাজারে অবস্থিতি করিতেন ও বেলিয়াঘাটায় দুইটী আড়ত খুলিয়া ছিলেন। একটীতে বাঁশ ও অপরটিতে মকিমপুর তালুকজাত দ্রব্যাদি বিক্রীত হইত। প্রথমে ৪।৫ বৎসর ঐ তালুক হইতে কিছুই ধান্যাদি পাওয়া যায় নাই। পরে সময় সময় বন্যা আসিয়া পলি পড়িয়া গেল; যাহা অসমতল ছিল সমতল হইয়া গেল; যাহা জলগণ্ড ছিল তাহা বড় বড় দীর্ঘিকায় পরিণত হইল; যাহা অনুর্ব্বর ছিল তাহা উর্ব্বর হইল। অল্পদিনের মধ্যেই ধান, পাট, মুগ, মসুর, বংশ, গুড় ইত্যাদি প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হইতে লাগিল। লক্ষ্মী যাঁহার প্রতি সদয়া হন, তাঁহার আর অভাব থাকে না। প্রীতরাম দাসের ভাগ্য সুপ্রসন্ন, সুতরাং তিনি মকিমপুর তালুক হইতে যথেষ্ট আয়বান হইলেন।

নাটোর ষ্টেটের দেওয়ান পদে সুখ্যাতির সহিত কার্য্য করিয়া কলিকাতায় ফিরিয়া আসিবার পর জানবাজারস্থ যুগল কিশোর মান্না মহাশয় তাঁহার কন্যার সহিত প্রীতরামের বিবাহ দেন। এই বিবাহে তিনি প্রীতরামকে যৌতুক স্বরূপ ১৬/০ বিঘা জমী দান করেন। বিবাহের কিছুদিন পরে যৌতুকস্বরূপ প্রাপ্ত জমীতে একটী বাটী নির্ম্মাণ করাইয়া দুই ভ্রাতা ও স্ত্রী সহ প্রীতরাম তাহাতে বাস করিতে লাগিলেন। কালে প্রীতরাম দুইটী পুত্ররত্ন লাভ করেন। জ্যেষ্ঠের নাম হরচন্দ্র ও কনিষ্ঠের নাম রাজচন্দ্র। প্রীতরামের জীবিতাবস্থায় তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র হরচন্দ্র অপুত্রক অবস্থায় পরলোকগমন করেন। ১২০৮ সালে চাণক নামক স্থানে রাজচন্দ্রের প্রথম বিবাহ হয়। ঐ বৎসরেই প্রথমা স্ত্রীর মৃত্যু হওয়ায়

রাজচন্দ্র দ্বিতীয় বার দারপরিগ্রহ করেন। দ্বিতীয়া স্ত্রীও কিছুকাল পরে কালগ্রাসে পতিতা হন। রাজচন্দ্র দুইবার উপর্য্যুপরি পত্নীহীন হইয়া পুনরায় দারপরিগ্রহে বীতরাগ হইয়াছিলেন। কাজেই তাঁহার পিতা প্রীতরাম বংশলোপের আশঙ্কায় অস্থির হইয়া পড়েন।

রাণী রাসমণির সুলক্ষণ সৌন্দর্য্যে * রাজচন্দ্রের চিত্ত বিবাহ সম্মতি দানে আকৃষ্ট হইয়াছিল। প্রীতরাম বাবুও বংশলোপের আশঙ্কার চিন্তা হইতে নিরস্ত হইয়াছিলেন। সৌভাগ্যক্রমে এই ধনকুবের জমিদার বংশেই রাণীর বিবাহ সম্বন্ধ স্থির হইয়া গেল। প্রীতরাম বাবুর বন্দোবস্ত অনুসারে রাণীর পিতা হরেকৃষ্ণ দাস সপরিবারে কলিকাতার গোয়ালটুলীর একটী বাড়ীতে আগমন করিয়া রাজচন্দ্র বাবুর সহিত রাণীর শুভ পরিণয় ক্রিয়া সমাধা করেন। ১২১১ সালের ৮ই বৈশাখ তারিখে এই শুভ বিবাহ কার্য্য সম্পন্ন হইয়াছিল। বিবাহে বিশেষ আড়ম্বর কিছুই হয় নাই বটে, কিন্তু ভাগ্যবতী রাণী ভাগ্যবান ধনাঢ্যের গৃহবধূ হওয়ায় তাঁহার রাণী নামের সার্থকতা রক্ষিত হইয়াছিল।

---

* নৌকাযোগে ত্রিবেণীতে গঙ্গাস্নান করিতে যাওয়া রাজচন্দ্র বাবুর অভ্যাস ছিল। তাঁহার সঙ্গীরা কোণার ঘাটে সুলক্ষণা রাণীকে দেখিয়া পরিচয় গ্রহণান্তর এক দিন রাজচন্দ্র বাবুকে নৌকা হইতে দেখাইয়া ছিলেন। তাঁহার সম্মতি বুঝিয়া পরে ঘটক পাঠাইয়া প্রীত-রাম বাবু হরেকৃষ্ণ দাসের নিকট বিবাহ প্রস্তাব করেন। সেই প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত হয়।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

বধূরাণী—রাজচন্দ্র বাবুর অর্থাগম।

রাণী রাসমণি শ্বশুরালয়ে আসিয়া নিজগুণে শ্বশুর, শাশুড়ী, স্বামী প্রভৃতি গুরুজন ও আত্মীয়বর্গ সকলকেই মুগ্ধ করিয়াছিলেন। কি গৃহস্থালীর কার্য্যে, কি দেবসেবায়, কি লোকজন শুশ্রূষায় সকল বিষয়েই তাঁহার সহিষ্ণুতা, বুদ্ধিমত্তা ও ধর্ম্মভাব পরিলক্ষিত হইতে লাগিল। সুলক্ষণা পুত্র-বধূ পাইয়া প্রীতরাম বাবু শেষ জীবনে সুখী হইয়াছিলেন। যে দিন হইতে রাণী রাসমণি শ্বশুরালয়ে আসিয়াছিলেন প্রত্যহ শ্বশুর শাশুড়ীর পাদোদক পান করিয়া তবে আহার করিতেন। রাণীর কার্য্যের অবসর নাই। প্রভাতে উঠিয়াই গৃহকর্ম্মে নিযুক্ত হইতেন আর রাত্রি দ্বিপ্রহর পর্য্যন্ত তাঁহার কার্য্যের শেষ নাই। ঠাকুর-ঘর পরিষ্কার, পুষ্পচয়ন প্রভৃতি কার্য্যেও রাণীকে দেখিতে পাওয়া যাইত, আবার রন্ধনশালায়ও রন্ধনের সাহায্য করিতে দেখিতে পাওয়া যাইত। শাশুড়ী তাঁহাকে কতবার বারণ করিতেন, তথাপি রন্ধনশালায় যাইতে বিরত হইতেন না। সংসারের কাজকর্ম্ম সারিয়া প্রতিদিন পূজাহ্নিক করিতেন। পিত্রালয়ে শৈশবেই তিনি মাতাপিতার অনুকরণে সমস্তই শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন। ধনকুবেরের রাজসংসারে আসিয়া তাঁহার চরিত্রের কিছুমাত্র ভাবান্তর হয় নাই, বরং তাঁহার ধর্ম্মভাব ও চরিত্র আরও দিন দিন উৎকর্ষ লাভ করিতেছিল। বিশেষতঃ, তাঁহার স্বামী রাজচন্দ্র বাবুর শিক্ষাদান ফলে তিনি ক্রমেই অধিকতর গুণবতী হইতে সুযোগ পাইয়াছিলেন। পিতৃগৃহে যে শিক্ষা পাইয়াছিলেন শ্বশুরালয়ে আসিয়া আরও তাহার স্ফুটতর বিকাশ পাইতেছিল।

বিবাহের পর রাজচন্দ্র বাবুর উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি হইতেছিল। তাঁহার অজস্র অর্থাগম হইতে লাগিল। নানাদিক হইতে নানাভাবে দিন দিন বহু অর্থ সংগ্রহ হইতেছিল। জমিদারীর আয়, ব্যবসায়ের আয় ক্রমেই বাড়িতেছিল *।

এই সময়ে তিনি কলিকাতার মধ্যে যে সমস্ত জমী ও বাটী ইত্যাদি ক্রয় বা প্রস্তুত করাইয়াছিলেন তাহার তালিকা এই :—

স্থান		কুঠী ও জমি	পরিমাণ।
১১ নং	রসেল ষ্ট্রীট	দোতলা কুঠী সমেত	বি ৯/১৸৶০'
২	পলক ষ্ট্রীট	ঐ	৸২৸৶০
৭৪	ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট	ঐ	১৸০৶০
৫১	ফ্রী স্কুল ষ্ট্রীট	ঐ	১/২৸০
৭৫	ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট	ঐ	১।৪॥৶০
৩	কোবার্ণ লেন	জমি	।২॥/০
৪	উমাচরণ দাসের লেন	ঐ	।৩।০
১৭	মার্কেট ষ্ট্রীট	ঐ	॥০/০
৪৭	মনোহর দাস ষ্ট্রীট	কুঠী	/০।৶৹
৬৪	ডাক্তার লেন	দোতলা	২/৪
১	রামহরি মিস্ত্রী লেন	জমি	/১।৶০
৭১	ফ্রী স্কুল ষ্ট্রীট	কুঠী	৬।৩

* কথিত আছে, একদিন একস্চেঞ্জ আফিসের নীলামে ৫০ হাজার টাকা লাভ করিয়াছিলেন। এই রূপ প্রায়ই তিনি অর্থার্জ্জন করিতেন।

স্থান	কুঠী ও জমি	পরিমাণ।
৭২ ফ্রী স্কুল ষ্ট্রীট	দোকান	—
৩ "	জমি	
৩৮, ৩৯, ৪০ মার্কেট ষ্ট্রীট	জমি	১॥০॥৶০
১৩০ জান বাজার ষ্ট্রীট	ঐ	/২।৶০
১০ মির্জ্জাপুর লেন	গুদাম	॥১৸০
৩৬ নীলমণি হালদার লেন	ঐ	।৪
২০১—২০৫ পুরাতন চীনাবাজার	দোতলা	১/২৸৶০
৮ ওয়েলেসলী ষ্ট্রীট	জমি	৩৸৩।৶০
২৬ ঐ	ঐ	২॥০॥০
৭৭ ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট	ঐ	১॥৪৸/০
৯৯ জানবাজার ষ্ট্রীট	কুঠী	১/২।/০
১ মুন্সি সদরুদ্দী লেন	জমি	/৪৸৵০
৪ গোয়ালটুলী	ঐ	/৪৶০
৪৫ মটস্ লেন	কুঠী	১।২
১৬ মার্কেট ষ্ট্রীট	জমি	॥৪৸০
১২৫ জানবাজার ষ্ট্রীট	ঐ	॥০।০
৭৬ ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট	দোতলা	১॥০৸/০
৭ উমাচরণ দাসের লেন	জমি	৸৩॥৶০
৮৭ তালতলা	বস্তি	।৪
৪৬ জান বাজার	ঐ	৯৸০।৶০
৩৭ "	ঐ	—
১৮ "	দোকান	/১॥৶০
১১২ "	বস্তি	।৩৶০

স্থান		কুঠী ও জমি	পরিমাণ।
১১৫	জানবাজার	ঐ	/৩৶০
৭৫।১	ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট	কুঠী ও আস্তাবল	/২৸৵০
৪	ফ্রী স্কুল ষ্ট্রীট	দোকান	/০॥/০
৫	গোয়ালটুলী	বস্তি	/৩॥৶০
৯	দত্ত লেন	ঐ	।০/০
১২	মার্কুইস্ ষ্ট্রীট	ঐ	।১৶০
১৬	মিশ্রী খানসামা লেন	জমি	।৪৶০
১২	শাঁখারীটোলা লেন	ঐ	/২।৵০
১০	সরিফ দপ্তরী	বস্তি	।০৸০
২	কীড ষ্ট্রীট	ত্রিতল কুঠী	৫॥৪॥৵০
১	ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান ষ্ট্রীট	দ্বিতল	১।৪৸৶০
২৪	চৌরঙ্গী	ঐ	২।০৵০
২৫	ওয়েলেস্লী	জমি ও দোকান	১৸২
৬৪	জানবাজার ষ্ট্রীট	জমি	।২।০
১৫	মট্স্ লেন	ঐ	।১।৵০
১২	কোড়া বরদার লেন	বস্তি	।৩।০
৯	তালতলা	ঐ	/২॥০
	বেলেঘাটা	বাজার, বাগান, কুঠী, জমি, পুষ্করিণী	২৫/৩
	জগুবাবুর বাজার ভবানীপুর		৩/০
	কালিঘাট	বাগান, কুঠী, পুষ্করিণী, গঙ্গার ঘাট	২/০
	সিঁতি	বাগান, পুষ্করিণী	৩/৪

কলিকাতার মধ্যে তাঁহার এই সমস্ত সম্পত্তির আয় যে কত তাহার পরিমাণ অনুমান করুন। এই সমস্ত জমি ও কুঠীর মধ্যে অনেকগুলি আশাতীত মূল্যে বিক্রীত হইয়াছিল। বসেল ষ্ট্রীটের জমি ও কুঠী প্রায় দুই লক্ষ টাকায় গবর্ণমেণ্ট ক্রয় করিয়াছিলেন। এতদ্ব্যতীত মফস্বলস্থ ঘীপুকুর, জগন্নাথপুর, মকিমপুর ও কলবা হোসেনপুর এই চারিটী মহালের আয়ও যথেষ্ট ছিল। রাজচন্দ্র বাবু স্বকীয় অধ্যবসায় প্রতিভা, ব্যবসায়ে তীক্ষ্ণবুদ্ধিতা ও সচ্চরিত্রতা বলে তৎকালীন বঙ্গীয় ধনকুবের বর্গের অগ্রণী হইতে সমর্থ হইয়াছিলেন। রাণী রাসমণির ন্যায় গুণবতী ভার্য্যা সম্মিলন তাঁহার সুযশ ও সুনাম লাভের অন্যতম কারণ ছিল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

রাজচন্দ্র বাবুর সহিত জনবেব সাহেবের বন্ধুত্ব।

সে সময় কলিকাতার অবস্থা বিশেষ উন্নত ছিল না। এখন যেখানে বৈঠকখানার বাজার সেইখানে একদিন অশ্বত্থ তলায় বসিয়া জব চার্ণক (Job Charnock) সাহেব ফরসীতে ধূমপান করিতেছিলেন ও কুণ্ডলীকৃত ধূমরাশি উদ্গীরণ করিতে করিতে ভাবিতেছিলেন যে কলিকাতাই বাণিজ্যের উত্তম স্থান। সে কল্পনা আজ সত্যে পরিণত হইয়া ফলপ্রদ হইয়াছে। ১৬০০ খৃঃ রাণী এলিজাবেথের রাজত্বের শেষভাগে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোং রাজকীয় সনন্দ লাভ করিয়া ৩০১৩৩ পাউণ্ড ৫ শিলিং ৮ পেন্স বা বর্ত্তমানের ৪,৫২,০০০৲ টাকা মূলধনে কার্য্য আরম্ভ করেন। মূলধন ১০১ ভাগে বিভক্ত ছিল। ইংলণ্ডেশ্বর ১ম চার্লসের রাজত্বকালে ১৬৪৫ খৃঃ উক্ত কোং দ্বিতীয়বার নূতন সনন্দ প্রাপ্ত হন। এই সময়ে বৌবাজার, শিয়ালদহ, শিবতলা, মৃজাপুর প্রভৃতি স্থান লবণ হ্রদের আধার ছিল। কেল্লার নিকটবর্ত্তী স্থান সমূহকে গড়গোবিন্দপুর বলা যাইত। উহার আয়তন ১০৪১৷৷৩৷৷০ বিঘা ছিল। এখন যে প্রশস্ত গড়ের মাঠ দৃষ্ট হয়, তখন উহাতে হোগলা বন ছিল। কুমারটুলী, বাগবাজার স্থান সমূহকে সুতানুটী বলা যাইত, উহার পরিমাণ ১৮৬১০/২৷৷০ বিঘা ছিল। ইটালী, বেণিয়াপুকুর, ভবানীপুর স্থান সমূহকে ডিহি কলিকাতা বলা যাইত। ইহার পরিমাণ ১৭০৪/৩ বিঘা ছিল। হলওয়েল সাহেব এই সীমা নির্দ্দেশ করেন।

তখন খাদ্য দ্রব্যাদি এত মহার্ঘ ছিল না ; বেশ স্থলভ ছিল—চাউল ১৲ ১।০ মণ ; তৈল ⁄৭, ⁄৮ সের টাকায় ; ঘৃত ⁄১॥০ ৵২, সময়ে সময়ে ঘৃত ১২৲ টাকা মণ পাওয়া যাইত। গুড় ১৵০, ১।০ মণ। লবণ ৵০ সের ; দুগ্ধ ১৬।২০ সের টাকায় ; মৎস্য ৮৲।১০৲ টাকা মণ পাওয়া যাইত। পুলিস প্রহরীর এত আড়ম্বর ছিল না। পুলিস কর্ম্মচারী থাকিবার স্থানকে ফাঁড়ি বলিত। চৌকিদার বাহাল ছিল, তাহারা তরবারি ব্যবহার করিত। সময়ে সময়ে বড় বড় লাঠিও থাকিত। ক্রমে ক্রমে ব্যাটম বা রুল সৃষ্টি হয়। ইহাদের গায়ে জামা, পায়জামা, মাথায় পাগড়ী, লাল টুপি ছিল। তখন রাজপথের এত সৌষ্ঠব ছিল না। রাস্তা ঘাট ইষ্টকচূর্ণ দ্বারা নির্ম্মিত হইত। রাজপথের দুই ধারেই পয়োনালী ছিল। আবর্জ্জনা তদ্দ্বারা বাহিত হইয়া গঙ্গায় পতিত হইত। রাজপথের দুই পার্শ্বে নারিকেল তৈল, পরে এরণ্ড তৈল, পরে কেরোসিন, পরে গ্যাসালোক হয়। কলিকাতার চতুঃপার্শ্ববর্ত্তী স্থান সমূহ পল্লীগ্রাম বলিয়াই বোধ হইত। সন্ধ্যার পর আর কেহ পথ চলিত না, প্রাণাপহারী দস্যু-ভীতি প্রবল ছিল। আলি নামক মুসলমানের নাম অনুসারে আলিপুর হয়। কিড (Col Kid) সাহেবের নামে খিদিরপুর নাম হয়। চিত্রেশ্বরী সর্ব্বমঙ্গলার নামে চিৎপুর হয়। মাণিক নামক মুসলমান পীরের নামে মাণিকতলা হয়। জেলেপাড়া, ছুতারপাড়া, কাঁসারিপাড়া, কুমারটুলী, বেণেটোলা, শুঁড়ীপাড়া, এই সকল স্থানে লোকে জাতীয় ব্যবসায় করিত বলিয়া ঐরূপ নাম হয়।

মহারাজ নবকৃষ্ণ শোভাবাজারে ও ঠাকুরবংশ পাথুরিয়া ঘাটায় বাস করিতেন। রায় রায়ান্ মহারাজ রাজবল্লভ বাহাদুর সুতানুটীতে বাস করিতেন। মহারাজ নন্দকুমারের পুত্র রায় রায়ান্ গুরুদাস চড়কডাঙ্গায় বাস তেন। গবর্ণর ভান্সিটার্ট সাহেবের মুৎসদ্দি আন্দুল রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা

দেওয়ান রামচরণ রায় পাথুরিয়া-ঘাটায় থাকিতেন। *দেওয়ান গঙ্গা গোবিন্দ সিংহ জোড়াসাঁকোয় থাকিতেন। দেওয়ান হৃদয়রাম বন্দ্যোপাধ্যায় বহুবাজারে থাকিতেন। ইহাঁদের অনেকের সহিত রাজচন্দ্র বাবুর সৌহার্দ্দ্য ছিল। প্রিন্স দ্বারিকানাথ ঠাকুর, অক্রুর দত্ত, কালীপ্রসন্ন সিংহ, স্যার রাজা রাধাকান্ত দেব বহাদুর প্রভৃতির সহিত বিশেষ ঘনিষ্ঠতা ছিল। লর্ড অকল্যাণ্ড সাহেবের সঙ্গে বিশেষ প্রণয় ছিল।

কলিকাতার এইরূপ অবস্থায় লণ্ডন নগরীস্থ তদানীন্তন ধনকুবের ও অভিজাতবর্গের অগ্রণী মহাত্মা জন বেব সাহেব ভারতবর্ষ পরিদর্শন করিতে আসিয়াছিলেন। "যে ইষ্ট-ইণ্ডিয়া-কোম্পানী ভারতে সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিতেছিলেন, জন বেব সাহেব সেই ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর এক জন প্রধান অভিজাত অংশীদার ছিলেন। তিনি অতীব কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া বাণিজ্যের অছিলায়, প্রায় ছদ্মবেশে অনাড়ম্বরে কোম্পানীর নববিজিত ভারতবর্ষ দেখিবার জন্য আগমন করেন। তিনি ব্যতীত মহামান্য ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কোন অভিজাত মালিক না কি আর ভারতবর্ষে পদার্পণ করেন নাই। তিনি কলিকাতা আসিয়াই (রায় বাহাদুর) রাজচন্দ্র দাস মহাশয়ের উদার ভাব দর্শনে অতীব প্রীত হইয়া তাঁহার সঙ্গে আজীবন বন্ধুতা-শৃঙ্খলে শৃঙ্খলিত হইয়া পড়েন। মহাত্মা জন বেব তাঁহাকে অপার সম্পদে ও গৌরবে * উন্নীত করেন। তিনি ইংলণ্ডে প্রত্যাগমন করিয়াও বন্ধুর কথা বিস্মৃত হইতে পারেন নাই; তাই ১৮২৮ খৃঃ জানুয়ারী মাসে একটী স্বর্ণ ঘড়ি রাজচন্দ্র দাস মহাশয়কে অপার স্নেহের চিহ্নস্বরূপ

---

* তদীয় বংশধর পঞ্চাশ জন অশ্বারোহী বেষ্টিত হইয়া চতুরশ্বযানে ভ্রমণ করা প্রভৃতি সম্মানপ্রাপ্তির অধিকার সনদ ত্রৈলোক্য বাবুর হস্তে নিহিত ছিল। ভারতবর্ষের বড় লাট বাঙ্গালীদের মধ্যে সর্ব্ব প্রথমেই ৺রাজচন্দ্র দাস মহাশয়ের উদ্যানে নিমন্ত্রণ রক্ষা করেন বলিয়া প্রকাশ।

পাঠাইয়া দেন।[১] ঐ ঘড়িটী এখনও রাজচন্দ্র বাবুর অন্যতম দৌহিত্র ত্রৈলোক্য বাবুর পুত্রদের নিকট রহিয়াছে। উহাতে নিম্নলিখিত বর্ণাবলী খোদিত আছে :—

"A TOKEN OF ESTEEM
SENT BY
JOHN BEBB Esq. of London
TO HIS FRIEND
Babu RAJ CHANDRA DAS,
January 1826."

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

রাজচন্দ্র বাবুর সন্তানাদি ও সৎকার্য্য।

বঙ্গাব্দ ১২১৩ সালে রাণীর প্রথম কন্যা পদ্মমণি ~~দাসীর~~ দেবীর জন্ম হয়। মহা ধূমধামে তাহার নামকরণ ও অন্নাশন হয়। ১২১৮ সালে রাণীর দ্বিতীয় কন্যা কুমারীর ও ১২২৩ সালে তৃতীয় কন্যা করুণার জন্ম হয়। ১২২৪ সালে প্রীতরাম বাবু জ্বর রোগে স্ত্রী যোগমায়া, রাজচন্দ্র, দুই কন্যা, দুই পুত্রবধূ, তিন দৌহিত্রী ও নগদ ৬॥ লক্ষ টাকা ও জমিদারী রাখিয়া পরলোক গমন করেন। বহু আড়ম্বরে রাজচন্দ্র বাবু পিতৃশ্রাদ্ধ সমাধা করেন। বহু দিগ্দেশাগত ব্রাহ্মণ পণ্ডিত, ভাট ভিখারী, অনাথ, আতুর প্রভৃতি দান, পান, ভোজন, বিদায়ে পরিতুষ্ট হয়। ১২২৬ সালে রাণী এক মৃতপুত্র প্রসব করেন। ১২৩০ সালে তিনটী ঘটনা হয়; প্রথম—৩০ সালের ভীষণ বন্যা, তাহাতে রাণীর বিপন্নদিগকে আশ্রয় দান, পান ভোজনের ব্যবস্থা করিতে বহু অর্থ ব্যয় হয়; দ্বিতীয়—রাণীর চতুর্থ কন্যা জগদম্বার জন্ম হয়; তৃতীয়—রাণীর পিতা হরেকৃষ্ণ দাস পরলোক গমন করেন।

রাণী পিতার চতুর্থী করিবার জন্য গঙ্গা তীরে যাইয়া দেখেন—ঘাট অতিশয় পঙ্কিল, বন্ধুর, ইষ্টকপ্রস্তর ইতস্ততঃ বিশৃঙ্খলভাবে পতিত, স্নানের বিশেষ অসুবিধা। সে দিবস কার্য্য সমাধা হইলে বাটী আসিয়া, রাজচন্দ্র বাবুর নিকট ঐ ঘাট বাঁধাইয়া দিবার প্রস্তাব করেন। রাজচন্দ্র বাবু স্বীকৃত হন ও গ্যারিজন আফিসের (Garrison Officer)

অনুমতি লইয়া বহু অর্থব্যয়ে 'বাবু রোড' ও 'বাবু ঘাট' নির্ম্মাণ করাইয়া দেন। অদ্যাপিও ঘাটের উপর এই কয়েকটী কথা প্রস্তর ফলকে খোদিত আছে।

The Right Honorable Lord William Cavendish Bentinck, G.C.B. & G.C.H. Governor General, &c., &c., &c. with a view to encourage the direction of private munificence to works of public utility has been pleased to determine that this ghaut constructed in the year 1830 at the expense of Baboo Raj Chunder Doss shall hereafter be called Baboo Raj Chunder Doss's Ghaut."

ছত্রিশ থাম ও চাঁদনীযুক্ত ঘাট। ঐ ঘাটের উপর দিয়া এখন পোর্ট ট্রাষ্ট রেলওয়ে গিয়াছে। সে দিন এই ঘাট কোর্ট অব ওয়ার্ড কর্ত্তৃপক্ষের চেষ্টায় মেরামত হইয়াছে। এই ঘাটে আজও রাণী রাসমণির কথাগুলি যেন প্রতিধ্বনি করিতেছে। লোকে উহাকে বাবুঘাট বলে।

রাণী রাসমণি যেমন গুণবতী, তেমনই মনস্বী স্বামী পাইয়া তাঁহার সদ্গুণরাশির উন্মেষ লাভে সুযোগ ঘটিয়াছিল। রাজচন্দ্র বাবু অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিপতি হইয়াও একদিনও নিরলস অবস্থায় নিশ্চেষ্ট ছিলেন না। প্রত্যহ তাঁহাকে ব্যবসা ও জমিদারীর কার্য্য পর্য্যবেক্ষণ করিতে ব্যস্ত থাকিতে হইত। বড় বড় সাহেব সুবার সহিত তাঁহার বিশেষ প্রণয় ছিল। তিনি রাণী রাসমণির ন্যায় গুণবতী ধর্ম্মশীলা স্ত্রীর পরামর্শ ব্যতীত কোন কার্য্য করিতেন না। বলা বাহুল্য, রাণী রাসমণি প্রীতরাম বাবুর অতি আদরের পুত্রবধূ হইয়াছিলেন। সেই আদরেই তাঁহার হৃদয়ে ও মনে যে সকল গুণ ছিল তাহা প্রস্ফুটিত হইতে থাকে।

রাণীর সহিত পরামর্শ করিয়া রাজচন্দ্র বাবু বহুবিধ সৎকার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে কয়েকটী মাত্র আমরা উল্লেখ করিতেছি :—

আহিরীটোলায় গঙ্গায় সাধারণের স্নানের ঘাট। মাতার নাম ও স্মৃতিরক্ষা করিবার জন্য ও জনসাধারণের অসুবিধা দূর করিবার জন্য রাজচন্দ্র বাবু বহু অর্থব্যয়ে ঐ ঘাট নির্ম্মাণ করাইয়া দেন।

নিমতলায় মুমূর্ষু গঙ্গাযাত্রীদিগের জন্য গৃহ নির্ম্মাণ। পূর্ব্বে বড় কষ্ট ছিল। রাণী রাজচন্দ্রবাবুকে বলিয়া এই খানে ১টী গৃহ, ১টী দ্বারবান, ২টী ভৃত্য ও একজন চিকিৎসক নিযুক্ত করেন। উহা এখন পোর্ট ট্রাষ্ট রেলের পার্শ্বে পড়িয়া আছে।

মেটকাফ্ হলে গবর্ণমেণ্ট লাইব্রেরীর উন্নতিকল্পে এক কালীন ১০০০০৲ দশ হাজার টাকা দান।

বেলেঘাটার খালের জন্য নিজ জমি গবর্ণমেণ্টকে দান করেন। খালের উপর পুল তৈয়ারী হইবার আগে সাধারণে যাহাতে বিনা ব্যয়ে পারাপার হইতে পাবে তজ্জন্য রাজচন্দ্র বাবু ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। নিজ জমি বিনা মূল্যে ছাড়িয়া দেওয়াই সেই ব্যবস্থা।

চাণকের তালপুকুর অন্য লোকের ছিল। তিনি নিজ ব্যয়ে উহা খনন করাইয়া সাধারণের জলকষ্ট নিবারণ করেন ও আশীর্ব্বাদভাজন হন।

আর একটি ঘটনায় রাজচন্দ্র বাবুর সত্যপ্রিয়ত্ব ও মহত্বের নিদর্শন প্রকটিত। হুক ডেভিডসন এণ্ড কোং নামক কোন বিদেশী বণিককে দেউলিয়া জানা সত্ত্বেও তাঁহার ভগিনীপতী রামরতন বাবু এক লক্ষ টাকা ঋণ দেওয়াইয়া দেন। রামরতন বাবু উক্ত কোম্পানীর মুৎসুদ্দি ছিলেন। তখন রাজচন্দ্র বাবুর মাতা কঠিন পীড়ায় মৃত্যুশয্যায় শায়িতা, তথাচ তিনি ঐ টাকা দেন। জলে ফেলিয়া দেওয়ার মত এক লক্ষ টাকা দেওয়া হয়। সাহেব আসিলে, রাজচন্দ্র বাবু মাতার পীড়ার কথা বলিয়া তিন দিন পরে টাকা দিবেন বলেন; তাহাতে সাহেব বলেন—"কল্যই টাকা না দিলে বিশেষ ক্ষতি হইবে।" 'ভাল তাহাই হইবে' বলিয়া রাজচন্দ্র বাবু সাহেবকে বিদায়

দেন। রাত্রে শুনিলেন যে সাহেব দেউলিয়া হইয়া বিলাত যাইতেছেন। প্রাতে রামরতন বাবু সাহেবকে লইয়া আসিলে রাজচন্দ্র বাবু বিনা আপত্তিতে অম্লানবদনে টাকা গণিয়া দিলেন। পরে রামরতন বাবুকে বলিলেন-- "আমার টাকা কি টাকা নয়, সাহেব দেউলিয়া হইয়াছেন জানা সত্ত্বেও আপনার জন হইয়া এ কাজটা করা কি ভাল হইয়াছে?" উত্তরে বাম-রামরতন বাবু বলেন—"আপনিও বিশেষ অবগত ছিলেন, 'না' বলিলেই ত পারিতেন।" তাহাতে রাজচন্দ্র বাবু বলেন—"একবার এই মুখে দিব বলিয়া আবার 'না' বলিতে শিখি নাই।"

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

রাণী রাসমণি-কুঠী।

রাজচন্দ্র বাবু ৭১ নং ফ্রীস্কুল ষ্ট্রীটে দ্বিতল বাটী প্রস্তুত করাইয়া বাস করিতেছিলেন। পরে এখন যে বাটী পাঁচ অংশে বিভক্ত হইয়াছে ঐ বাটী প্রস্তুত হয়। বিচিত্র সৌধের বিচিত্রতা অনেকাংশে না দেখিলে বুঝি বর্ণনায় কুলাইবে না। যদি চিত্রকর হইতাম, যদি তুলিকায় এই মনোরম সৌধ অঙ্কিত করিয়া সাধারণকে দেখাইতে পারিতাম, তবেই বোধ হয় বাসনা পূর্ণ হইত।

এখন যে দেহুড়িতে ফ্রীস্কুল ষ্ট্রীটের দিকে দ্বারবান্‌গণ বসিয়া থাকে, উহাই আদি সিংহদ্বার ও প্রবেশ দ্বার। বৃহদাকার প্রাকারের বৃহদাকার তোরণ। বৃহৎ কপাটের বক্ষে লৌহশুল বসান। ঐ বৃহৎ কপাটের আধাভাগে আবার একটি ক্ষুদ্রায়তন কপাট আছে। রাত্রি ১০টার পর বৃহদ্বার বন্ধ হইবার নিয়ম। বৃহদ্বার বন্ধ হইয়া গেলে ঐ ক্ষুদ্র দ্বার আগম নির্গমের জন্য ব্যবহৃত হইত। অবশ্য উৎসবে বৃহদ্বার সারা রাত্রি উন্মুক্ত থাকে। সিংহদ্বার উত্তীর্ণ হইলেই দুই ধারে দ্বারবান্‌দিগের বিশ্রামাগার, শয়নাগার, প্রহরার স্থান। সেই সকল স্থানের ভিত্তি গাত্রে দৃষ্টিপাত করিলে দেখা যাইত, উহাতে ঢাল, তরবারি, সড়কি, বন্দুক, রৌপ্যনির্ম্মিত শঙ্কর মৎস্যের পুচ্ছ, বল্লম, বর্শা, ভোজালি, খেটক, খর্পর, টাঙ্গী, পিতলের শুল বাঁধান ভিতরে শিশা ঢালা মোটা মোটা পাকা বাঁশের লাঠী; আবার

স্থানে স্থানে ঢোলক, ডুগডুগী, ডম্বরু, সারঙ্গী, সেতার, ঝাঁঝ, খঞ্জনী, করতাল, বাঁশের বাঁশী ইত্যাদি প্রমোদোপাযোগী, দ্বৌবাবিকদিগের হোলী ও ব্যসনের সম্বল, আবার তাহাব পার্শ্বেই মুদ্গর, লৌহ গোলক, লৌহধনুক, কাঠের বল পরীক্ষাব পাপড়া, গদ্সা কালসারের শৃঙ্গনির্ম্মিত রৌপ্যমণ্ডিত আততায়ীব আক্রমণ-রোধী হাতিয়ার, বলবৃদ্ধির পরিচায়ক অস্ত্রগুলি সজ্জিত আছে। আবাব তার পার্শ্বেই পাগড়ী, মুরাঠা, উষ্ণীষ, তাজ, কোমরবন্ধ, বুকবন্ধ, চাপরাস ইত্যাদি শোভা পাইতেছে। তার পব একধারে কতকগুলি ভাং প্রস্তুতের কুণ্ডি ও নিম্বদণ্ডের বৃহৎ বৃহৎ ঘোটনদণ্ড সজ্জিত রহিয়াছে। দণ্ডগুলি যেন এক একটি বংশদণ্ডের সংক্ষিপ্ত সংস্করণ। মধ্যে মধ্যে উপবে একটি আলোকাধার।

একজন দ্বারবানের কি বিশাল বক্ষ, পেশী সমন্বিত ভুজযুগ, গলদেশে স্বর্ণমণ্ডিত কামরাঙ্গা ফলের হাস্থলি, হাতে রূপার বলয়, কর্ণে বীরবৌলী, অঙ্গুলে অঙ্গুরীয়। অন্য একটী দ্বারবান্ ভয়ানক মূর্ত্তি —গজস্কন্ধ, গজচক্ষু, দেহ স্থূল ও মাংসল, পেশী দৃঢ় ও সরল, উচ্চতায় সকল দ্বৌবারিক অপেক্ষা কনিষ্ঠ, বলে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, কেশ-বিরল মস্তক, ঐ টী কুম্ভিগীব, সহসা দেখিলে মনে হয় যেন কুম্ভকর্ণেব প্রদৌহিত্র কি বৃকোদরের দূর সম্পর্কীয় জ্ঞাতি ভ্রাতা। এইরূপ ২৫।৩০ জন দ্বৌবারিক তোরণ-রক্ষক। অল্প অগ্রসর হইলেই দুই ধারেই চলন পথ। চলন পথ পার হইলেই দুই ধারে উপরে যাইবার দুইটী সোপান শ্রেণী। বামদিকের সোপান শ্রেণী দিয়া উপরে অন্তঃপুরে যাইতে পারা যায় ও দক্ষিণ দিকের সোপান শ্রেণী দিয়া উপরে বৈঠকখানায় যাইতে পারা যায়। অগ্রে নিম্নতলার কথাই বলা যাইতেছে। এই চলন পথ তিন দিক ব্যাপিয়া। উত্তরভাগে দেবতার স্থান, ঠাকুর দালান। মধ্যে বিস্তৃত প্রাঙ্গণ, প্রাঙ্গণে বাঁধা কাঠ গড়া। তিন দিক্‌কার চলন পথের পার্শ্বেই ক্ষুদ্র

ক্ষুদ্র গৃহ। কোনটী দেওয়ানখানা, কোনটী গোমস্তার, কোনটী সরকারের, কোনটী পাচক ব্রাহ্মণের, কোনটী পূজক ব্রাহ্মণের, কোনটী গৃহশিক্ষকের, কোনটী ভাণ্ডারির, কোনটী ফরাসের, কোনটী বাতিঘর, কোনটী ভৃত্যের আবাস, কোনটী ঢাকী ও ঢুলীর জন্য, কোনটী প্রতিমা-নির্ম্মাতা কুম্ভকারের জন্য, একটী ঘড়ী ঘর, উহাতে একটি কাঁসার বড় পেটা ঘড়ি থাকিত ও ঘণ্টায় ঘণ্টায় বাদিত হইয়া সময় ঘোষণা করিত। উহা এখনও আছে। পূর্ব্বদিকের গৃহগুলি উৎসবে, পার্ব্বণে, আহারীয় দ্রব্যাদি স্তরে স্তরে রাখা হইত। কোনটীতে রথ, রথের আসবাব সরঞ্জাম, ঘোড়া, সারথি, পতাকা, রজ্জু ও আশাসোটা ইত্যাদি থাকিত। কোনটি উদ্বোধনে ব্রাহ্মণদিগের বাসের জন্য ব্যবহৃত হইত। কোনটি দাশুরায়, গোবিন্দ অধিকারী ও আর আর সঙ্গীত সম্প্রদায়ের বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট হইত। কোনটী পূজার সময় পূজোপকরণ সজ্জিত হইত। কোনটিতে দোলের সময়কার আবির, কুমকুম্, ফাগ, রং পিচকারী, মঠ, ফুলের মালা ইত্যাদি রাখা হইত। কোনটিতে আড়ালি, স্বর্ণছত্র, রৌপ্যছত্র রাখা হইত।

উত্তরদিকে তিন মহল ঠাকুর দালান। শেষ মহলে ঠাকুরের স্থান। উপরে ৩২ ডালের ঝাড়, দুই পার্শ্বে ২৫ ডালের করিয়া দুইটী ঝাড়, নীচে ঠাকুরের কাছে সেজ জ্বলিত। পার্শ্বে একটী বৃহৎ মৃণ্ময় দীপ গব্য ঘৃতে ও কার্পাস তুলা সহযোগে জ্বালিত হইত। উহাই দুর্গা প্রদীপ। ঠাকুর দালানটী সমস্তই পঙ্কের কাজ করা। থামে দেওয়ালগিরী ও চিত্রপট শোভা পাইত। উপরে বহুমূল্যের চাঁদোয়া। মধ্য মহলে ষোড়শোপচারে পূজো-পকরণ রাখিবার ও ব্রাহ্মণদিগের বসিবার স্থান। শেষ মহলে দর্শকদিগের স্থান। শেষ মহলের পরেই কতিপয় সোপান শ্রেণী পরে প্রাঙ্গণ বলিদানের স্থান। দক্ষিণ দিকের গৃহগুলি পার হইলেই ফুলবাগান, তাহা এখন স্থানা-

ভাবে পাকশালা, অশ্বশালা, গোশালা, এবং যান বাহন রক্ষার স্থান হইয়াছে। উপরে বৈঠকখানা, উপরে ঝাড় লণ্ঠন, সেজ, দেওয়ালগির, বেল লণ্ঠনে গৃহ আলোকিত হইত। বড় বড় মুকুরে গৃহ প্রাচীর শোভিত ছিল। মহিষের বৃহৎ বৃহৎ শৃঙ্গ, মৃগশৃঙ্গ ও চর্ম্ম, কালসারের শৃঙ্গ ও চর্ম্ম, ব্যাঘ্র চর্ম্ম, ও মৃজাপুরী কারুকার্য্য খচিত গালিচায় শোভা পাইত।

পূর্ব্ব দিকে দবদালান ও রঘুনাথ জীউর স্থান। এটী প্রথম মহল। প্রথম মহল পার হইলেই দ্বিতীয় মহল। নীচে উপরে দুইটী চলন পথ প্রথম মহল হইতে দ্বিতীয় মহলে লইয়া গিয়াছে। ইহাতে নীচে ও উপরে অনেকগুলি গৃহ সজ্জিত। তাহা এখন ৺যদুনাথ চৌধুরী মহাশয়ের পুত্রগণের অংশে পড়িয়াছে। সদর ও মফঃস্বলে বিভক্ত করিয়া পঞ্চ ভ্রাতা পঞ্চ পাণ্ডবের মত প্রিয় পরিজন, পুত্র কন্যা লইয়া বাস করিতেছেন। অধুনা ইহাঁরাই যেন রাণীর গৌরব কতকাংশে অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছেন। ইহাই দ্বিতীয় মহল। দ্বিতীয় মহলে ছাদে যাইবার একটি গোল সিঁড়ী আছে। ইহার পরেই তৃতীয় মহল। ইহাতে ১টী প্রাঙ্গণ ও নীচে উপরে অনেকগুলি গৃহ আছে। ইহা গণেশ বাবুর অংশে পড়িয়াছে। তার পরেই ৪র্থ ও ৫ম মহল। ইহা বলাই বাবুর অংশে ছিল তিনি স্বেচ্ছায় উহা সীতানাথ বাবুকে বিক্রয় করিয়া ইটালীতে যাইয়া পৃথক বাটী নির্ম্মাণ করাইয়া বাস করিতেছেন।

ষষ্ঠ মহলে একটী পুষ্করিণী ছিল। তাহা মৃত্তিকায় পূর্ণ করিয়া এখন উহাতে গৃহাদি নির্ম্মিত হইয়াছে। সপ্তম মহালের অংশ বিশেষ গৃহ ও অশ্বশালা হইয়াছে। ইহাতে ন্যূনাধিক ৩ শত গৃহ, ৬টী প্রাঙ্গণ আছে। ১২২০ সালে ইহার নির্ম্মাণকার্য্য আরব্ধ হইয়া ১২২৮ সালে শেষ হয়। সার্দ্ধ ছয় বিঘাভূমিতে ৮ বৎসরে ২৫ লক্ষ টাকা ব্যয়ে এই কুঠি নির্ম্মিত হয়। ইহাই "রাণী-রাসমণি-কুঠী" নামে অভিহিত।

এতদ্ব্যতীত উমাচরণ দাসের লেনে রাণী যদুনাথ বাবুর জন্য স্বতন্ত্র একটী বাটী নির্ম্মাণ করান। দুঃখের বিষয়, জীবদ্দশায় যদুনাথ বাবুকে ঐ বাটীতে বাস করিতে হয় নাই। ইহার বহু বৎসর পরে রাণীর ৪র্থ কন্যা জগদম্বা দেবী ১৫ নং মার্কেট ষ্ট্রীটে ১৫ লক্ষ টাকা ব্যয়ে একটী বাটী প্রস্তুত করান। তাহাতে এখন ৺দ্বারিকা বাবুর সন্তানেরা বাস করিতেছেন।



সপ্তম পরিচ্ছেদ।

রাজচন্দ্র বাবুর পরলোকগমন।

শ্রাদ্ধ।

এক দিন রাজচন্দ্র বাবু আফিস গাড়ীতে ভ্রমণ করিতেছিলেন, সহসা তাঁহার সর্দ্দিগর্ম্মী ভাব উপস্থিত হইল। সংজ্ঞাশূন্য হইয়া গাড়ীতেই হেলিয়া পড়িলেন ও মাত্র ইঙ্গিতে চালককে বাটী যাইতে আদেশ করিলেন। অনতিবিলম্বে গাড়ী আসিয়া বাটীর দ্বারে পৌছিল, দ্বারবান্ কর্ম্মচারী শশব্যস্তে আসিয়া উপরে লইয়া পালঙ্কে রাজচন্দ্র বাবুর সংজ্ঞাশূন্য দেহ শায়িত করিলেন। অল্প সময়ের মধ্যেই সহরের বড় বড় ডাক্তার, মান্য, গণ্য, সম্ভ্রান্ত, ধনী, পরিচিত ব্যক্তিরা রাজচন্দ্র বাবুর পার্শ্বে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। বহু জনে বহু উপায়, বহু ঔষধ নির্ব্বাচন করিলেন। রাস্তায়, বাটীর সম্মুখে, সিড়ীতে নীচে উপরে ঘাস, বিচালী, সতরঞ্চ, গালিচা বিছাইয়া দেওয়া হইল, যেহেতু গাড়ীর ঘর্ঘর শব্দে পদশব্দে রোগীর রোগ বাড়িতে পারে। রাণী কোষাগার উন্মুক্ত করিয়া দিলেন; কিন্তু সকল চেষ্টা ব্যর্থ করিয়া রাজচন্দ্র বাবু বেলা ৫৷৷০ ঘটিকার সময় ১২৪৩ সালে ৪৯ বৎসর বয়সে ৩ কন্যা, ৩ জামাতা, ৪।৫ দৌহিত্র ও দৌহিত্রী রাখিয়া অংশুঘাত (Heat Appoplexy) রোগে দিব্যলোকে প্রস্থান করিলেন। তাঁহার পুত্রসন্তান ছিল না; রহিল মাত্র কীর্ত্তি, কীর্ত্তিমতী পত্নী, আর রহিল নগদ ৬৮ লক্ষ টাকা। ৮ লক্ষ টাকা বেঙ্গল ব্যাঙ্কের শেয়ার, ২ লক্ষ টাকা প্রিন্সকে ঋণ ও ১ লক্ষ টাকা হুক ডেভিডসন এণ্ড কোংকে ঋণ দেওয়া। রাণী আছাড়িয়া পড়িলেন। শুনা যায়, ৩ দিন ৩ রাত্র রাণী অনশনে ধরাসনে ছিলেন। বলিয়াছি,

সময় বড় সুচিকিৎসক; সময়ে সকল শোক প্রশমিত হয়। রাণীরও সময়ে সে শোক প্রশমিত হইল।

বর্দ্ধমানের মহারাজের মত এককালীন ব্রাহ্মণকে শত বা সহস্র বিঘা ভূসম্পত্তি দান বা পুরুষানুক্রমে বৃত্তির ব্যবস্থা বা কর্ণাটের ভূপালের মত সহস্র স্বর্ণমুদ্রা বিনিময়ে কাশী নরেশের নিকট আত্মবিক্রয় না করিলেও রাজচন্দ্র বাবু তাঁহার সময়োচিত সাধ্যমত দানে দীন দুঃস্থ, অনাথ, আতুর, অন্ধ, খঞ্জ কত শত লোকের অভাব মোচন করিয়া ধরায় অমর হইয়া আছেন।

শোকে দুঃখে এক মাস গত হইল। শ্রাদ্ধের দিন আসিল। শ্রাদ্ধের আয়োজন হইতে লাগিল। বাগবাজারনিবাসী গুরুদেব রামসুন্দর চক্রবর্ত্তী, পুরোহিত উমাচরণ ভট্টাচার্য্য আর আর বহুলোক সমবেত হইয়া দানসাগর শ্রাদ্ধের ব্যয়-তালিকা প্রস্তুত করিলেন। শ্রাদ্ধ দিনে সোণার ষোড়শ, বৃষোৎসর্গ ও তিলকাঞ্চন ইত্যাদি যথানিয়মে সমাধা হইল। বৃষ চিহ্নিত করিয়া ছাড়িয়া দেওয়া হইল। সংকীর্ত্তনসহ বৃষকাষ্ঠ গঙ্গাতীরে প্রোথিত করা হইল। নানা দিগ্দেশাগত নিমন্ত্রিত ব্রাহ্মণপণ্ডিতগণ উপস্থিত হইলেন। বহুল পরিমাণে বনাত, কম্বল, তৈজস, বস্ত্রাদি ক্রয় ও বিতরণ করা হইল।

প্রথম দিন শ্রাদ্ধের উপকরণদিগর সজ্জিত হইলে, প্রাঙ্গণ পূর্ণ হইয়া গেল; ব্রাহ্মণেরা যে যাহার কার্য্য করিতে লাগিলেন। যাঁহার যাহা প্রাপ্য, তাঁহাকে তাহা দেওয়া হইল। পর দিবস ব্রাহ্মণ-ভোজন, মহা কোলাহলে রাজ অট্টালিকা আকুলিত করিয়া তুলিল। ভোজন শেষ হইলে, বিদায়ের সময় আসিল। মিষ্টান্ন, সঘৃত গোধূমচূর্ণ-পেটিকা, দধি, ক্ষীর, ব্যঞ্জন এক এক জনে প্রচুর লইলেন। রাণীর অনুজ্ঞা ছিল যে, কেহ যেন মনঃক্ষুণ্ণ না হয়; তাহাই হইল। ব্রাহ্মণগণকে উপযুক্তরূপ

দক্ষিণা ও দান করা হইল। ব্রাহ্মণ বিদায়ের পর কাঙ্গালী বিদায় আরম্ভ হইল। সেও এক বিষম ব্যাপার! তাহাও সম্পন্ন হইল। তার পরদিবস নিয়ম ভঙ্গ। উহাও সমারোহে শেষ হইল। সকল কার্য্য সমাধা হইলে, আবার কাঙ্গালী-বিদায়ের ঘোষণা দেওয়া হইল। না জানি, কত লোকরই সেদিন সমাবেশ হইয়াছিল। অন্ধ, আতুর, অতিথি, খঞ্জ, দীন, দুঃস্থ, দুঃখী, বধির, ভাট, ভিক্ষু, পঙ্গু ইত্যাদি ইত্যাদি কতই না আসিল। আনু-মানিক ২৫।৩০ হাজার কাঙ্গালী সমাবেশ হইল। জানবাজার ফ্রীস্কুল ষ্ট্রীট, সমস্ত স্থানে বংশদণ্ড ও রজ্জুর সাহায্যে বন্ধনী দেওয়া হইল। বাটীতে কোথাও স্তূপাকার লুচি সজ্জিত রহিয়াছে, কোথাও স্তূপাকার বস্ত্র, কোথাও মিষ্টান্ন, কোথাও ব্যঞ্জন, কোথাও মৃৎপাত্র, কোথাও মৃণ্ময় ভাণ্ড, কোথাও কদলী পত্র ইত্যাদির সমাবেশ রহিয়াছে।

তৎপর উষাকালে কাঙ্গালী-বিদায় আরম্ভ হইল। ১টী মৃণ্ময় পাত্রে করিয়া লুচি, সন্দেশ ও মিষ্টান্ন, অন্য মৃৎ-ভাণ্ডে করিয়া ব্যঞ্জন, ১ খানি বস্ত্র ও অর্দ্ধ মুদ্রা করিয়া সকলকে দান করা হইল। ইহার মধ্যে ইতরবিশেষ ছিল না। বাল বৃদ্ধ যুবা প্রৌঢ় প্রৌঢ়া সকলকেই সমানভাবে দান করা হইল। সারা দিন ও সারারাত্রি সমভাবে দানকার্য্য চলিল। পরদিন প্রায় দেড় প্রহরের সময় দান কার্য্য শেষ হইল। সকলেই রাণীর জয় জয়কার করিতে করিতে ও আন্তরিক আশীর্ব্বাদ করিতে করিতে আপনাপন স্থানে চলিয়া গেল।

ইহার পর দিবস রাণী তুলট করেন। তাঁহার দেহের ওজনে তৌলদণ্ডে রৌপ্যমুদ্রার পরিমাণ করা হয়। মোট ৬০১৭৲ টাকা রাণীর দেহের পরিমাণে হয়। এই মুদ্রা ব্রাহ্মণদিগকে দান করা হয়।

একে একে ব্রাহ্মণগণ বিদায় লইলেন। শেষ এক জন সন্ন্যাসী আসিয়া উপস্থিত। ইনি আর কেহই নহেন, যিনি রাজচন্দ্র বাবুর

জীবদ্দশায় অকস্মাৎ দর্শন দিয়া, অযাচিতভাবে "রঘুনাথ জী" ঠাকুর * দিয়া গিয়াছিলেন। রাণী তাঁহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করাতে সন্ন্যাসী পরিচয় দিলে রাণী বিশেষ সমাদর করেন। রাণী তাঁহাকে বলেন যে, তিনি তাঁহাকে কিছু দিবেন, কিছু না দিলে যেন তাঁহাব প্রাণে তৃপ্তি হয় না। তাহাতে সন্ন্যাসী হাসিয়া বলিলেন যে, "দো চিজ হামকো দেনা, লোটা, আউর কম্বল।" সন্ন্যাসীর অনাসক্তি দেখিয়া রাণীর চক্ষে জল আসিল। একটী-লোটা ও একটা কম্বল তাঁহাকে দেওয়া হইল। তিনি রাণীকে আশীর্ব্বাদ করিলেন ও রঘুনাথ জীউ দর্শন করিতে চাহিলেন। রাণী সসম্ভ্রমে

---

* একদিন বৈশাখ মাসের দ্বিপ্রহরে রাজচন্দ্র বাবু নিদ্রা যাইতেছিলেন। এমন সময়ে জনৈক সন্ন্যাসী আসিয়া উপস্থিত। সন্ন্যাসীর গলদঘর্ম্ম হইতেছিল, বোধ হয় বহুদূর হইতে আসিয়াছেন। সন্ন্যাসীর উন্নত দেহ কৃশ কিন্তু বলিষ্ঠ, মাথায় জটা, পরিধানে গৈরিকবস্ত্র, গাত্রে গৈরিক বস্ত্রের আবরণ, নগ্নপদ ধূলি ধূসরিত। তিনি দেউড়ীতে আসিলেই দ্বারবানেরা তাঁহার আগমন কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি রাজচন্দ্র বাবুর সঙ্গে দেখা করিতে চাহিলেন। দ্বারবানেরা প্রথমে অস্বীকার করিল, আপত্তি করিল, শেষে অনেক বাকবিতণ্ডার পর অন্দরে দাসী দ্বারা সংবাদ দেওয়া হইল। রাজচন্দ্র বাবু বৈঠকখানায় আসিয়া সন্ন্যাসীকে উপরে আসিতে বলিলেন। তাঁহার অভিপ্রায় জানিতে চাহিলে, তিনি বলিলেন যে আমার নিকট রঘুনাথ জিউ ঠাকুর আছেন, আপনাকে দিব, আপনি উহার সেবা করিবেন, আপনার মঙ্গল হইবে, আমি বহু দূর দূর তীর্থপর্য্যটনে যাইব, ফিরিব কি না সন্দেহ। আরও কিছুক্ষণ কথা বার্ত্তার পর রঘুনাথজী ঠাকুরটী সন্ন্যাসী রাজচন্দ্র বাবুকে দিলেন। উহা মাত্র অর্দ্ধ হস্ত পরিমিত বিষ্ণুমূর্ত্তি। বিনিময়ে রাজচন্দ্র বাবু কিছু দিতে চাহিলে সন্ন্যাসী হাসিয়া বলিলেন "আমি দরিদ্র ভিক্ষুক নহি।" তিলার্দ্ধ দেরী না করিয়া তিনি চলিয়া গেলেন। মহাধুমধামে ঠাকুর প্রতিষ্ঠা করা হইল। পরে এই মূর্ত্তি চুরি যায়। সন্ধ্যাকালে আরতির সময় বিশাল বাটী বাদিত্র-নিস্বনে মুখরিত হইয়া কি অনির্ব্বচনীয় আনন্দ ও ধর্ম্ম-ভাব মনে আনিয়া দিত।

তাঁহাকে রঘুনাথ জীউ দর্শন করাইয়া প্রণত হইলে আশীর্ব্বাদ করতঃ সন্ন্যাসী বিদায় হইলেন।

শ্রাদ্ধের সমারোহ ব্যাপার নির্ব্বাহ হইল। দধিদুগ্ধে, পায়সে, ক্ষীরে, ব্যঞ্জনে, মিষ্টান্নে বৃহৎ রাজ অট্টালিকা বাসের অনুপযোগী হইয়া উঠিল। পুনরায় সংস্কার করা হইল। দাস, দাসী, দ্বৌবারিক, দেওয়ান, নায়েব, গোমস্তা, সরকার, কারকুন, ভাণ্ডারী, পাচক ব্রাহ্মণেরা বহু পরিশ্রমের পর বিশ্রাম লইল।

রাণী রাসমণি।

দ্বিতীয় খণ্ড।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

বিষয়-কার্য্যাদি পরিদর্শন—ব্রহ্মচর্য্য।

পতির পারলৌকিক ক্রিয়া সমাপনান্তে বহু কষ্টে পতিবিয়োগজনিত শোকাপনোদনপূর্ব্বক রাণী ব্রহ্মচারিণীর ন্যায় দিন যাপন করিতে লাগিলেন। প্রত্যহ প্রাতে শয্যা ত্যাগ করিয়া প্রাতঃকৃত্য সমাধা করিতেন; তদনন্তর পট্টবস্ত্র পরিধানপূর্ব্বক ঠাকুর রঘুনাথ জীউকে প্রণাম করিয়া স্ফটিকের মালা লইয়া জপ করিতেন। একটী মোটা তুলসীর মালা তাঁহার গলায় থাকিত; তাহার নিম্নেই এক গাছি সোণার হার শোভা করিত। বৈরাগ্যের নিদর্শন ও কাঞ্চনের আসক্তি যেন উজ্জ্বলে মধুরে মিশামিশি করিত।

রাণীর পুত্রসন্তান ছিল না; চারিটী মাত্র কন্যা—সিঁতীর রামচন্দ্র আটার সহিত প্রথমা কন্যা পদ্মমণির ও প্যারীমোহন চৌধুরীর সহিত দ্বিতীয় কন্যা কুমারীর বিবাহ হয়। তৃতীয়া কন্যা করুণাময়ীর সহিত মথুরামোহন বিশ্বাসের বিবাহ হইয়াছিল, কিন্তু একটী মাত্র পুত্র সন্তান

রাখিয়া করুণাময়ী পরলোক গমন করিলে, চতুর্থা কন্যা জগদম্বার সহিত পুনঃ মথুরামোহন বিশ্বাসের বিবাহ হয়। তিনটী জামাতাই বিশেষ সদ্‌গুণ-সম্পন্ন ও বুদ্ধিমান্ ছিলেন। তাঁহারা জানবাজারের বাটীতেই অবস্থিতি করিতেন।

রাজচন্দ্র বাবু যে অতুল ঐশ্বর্য্য রাখিয়া পরলোক গমন করিয়াছিলেন তাহার রক্ষণাবেক্ষণকল্পে রাণী বিশেষভাবে বিষয়কর্ম্মের ও জমিদারী হিসাবপত্রের কাগজ পর্য্যবেক্ষণ করিতেন। তাঁহার জামাতাগণের মধ্যে কনিষ্ঠ মথুরামোহন বিশ্বাস মহাশয় বিশেষ চতুর, কৌশলী ও ইংরাজী ভাষাভিজ্ঞ ছিলেন; তিনি রাণীর দক্ষিণ হস্ত স্বরূপ সমস্ত কার্য্যের তত্ত্বাবধান করিতেন।

এক সময়ে প্রিন্স দ্বারকা নাথ ঠাকুর কথা প্রসঙ্গে বলেন—'এ সকল অতুল বৈভব রক্ষণাবেক্ষণের জন্য একজন ম্যানেজার রাখিলে ভাল হয়, আপনি স্ত্রীলোক একাকিনী সকল দিক বজায় করিতে পারিবেন কি?'

রাণী যবনিকার অন্তরালে, মধ্যে মথুর বাবু; রাণী মনে মনে হাসিলেন ও বলিলেন—'হাঁ, তবে তেমন বিশ্বাসী লোক পাওয়া দুষ্কর।'

তাহাতে প্রিন্স বলেন,—'আমাকে যদি ম্যানেজার করা হয়, তবে আমিই সকল দিক বজায় রাখিব।'

রাণী বলেন—'সে ত খুব ভাল কথা। আমি এখনও জানিতে পারি নাই যে কোথা, কাহার নিকট, কি কি পাওনা আছে; তবে জানিতাম আমার স্বামী আপনাকে দুই লক্ষ টাকা ঋণ দিয়া যান, সেই টাকা যদি এখন পাওয়া যায়, তবে আমার বিশেষ উপকার হয়।'

প্রিন্স বলিলেন—'হাঁ সে টাকা আমি শীঘ্রই দিব। কল্য বিবেচনা করিয়া এ বিষয় বলিব।' পরদিন প্রিন্স আসিলে আবার কথা বার্ত্তা হইতে

লাগিল। প্রিন্সই প্রথমে বলিলেন—'উপস্থিত আমার নিকট টাকা নাই, তবে যদি বলেন আমার একখানি তালুক ঐ টাকার পরিবর্ত্তে লিখিয়া দিতে পারি।'

রাণী বলেন—'ঐ সম্পত্তির বার্ষিক আয় কত'?

প্রিন্স উত্তর করিলেন—'শালিয়ানা ৩৬ হাজার টাকা, মূল্য হিসাবে দুই লক্ষ টাকার অধিক।'

রাণী সম্মত হইলে প্রিন্স রংপুর দিনাজপুর জেলার অন্তর্গত পরগণা স্বরূপপুর তালুক লিখিয়া দেন। বর্ত্তমানে তাহার আয় বার্ষিক ৬৩ হাজার টাকা। কিছুদিন গত হইলে প্রিন্স রাণীর নিকট ম্যানেজার নিয়োগের কথা উপস্থাপিত করিলে রাণী চতুর জামাতা মথুর বাবুর দ্বারা বলিলেন—আমি বিধবা স্ত্রীলোক, আমার এই সামান্য বিষয়, আপনার মত যোগ্য ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিকে তত্ত্বাবধান করিতে বলা আমার ধৃষ্টতা মাত্র। আমার পুত্রস্থানীয় ভাবী উত্তরাধিকারী জামাতারাই ইহার কার্য্য পরিচালনা করিবেন।' প্রিন্স কৌশলে পরাজিত হইলেন, বলিলেন—'উত্তম, বুঝিলাম রাণী সামান্যা স্ত্রীলোক নহেন।' বিষয়াদি রক্ষণে এত তীক্ষ্ণবুদ্ধি না হইলে কি একজন স্ত্রীলোক এত সম্পত্তি ভোগ করিতে পারিতেন।

প্রতিদিন পূর্ব্বাহ্নে জমিদারী ও অন্যান্য বিষয় সংক্রান্ত মতামত প্রকাশ, আদেশপত্রে স্বাক্ষর, হিসাব পরিদর্শন, কর্ম্মচারী নিয়োগ প্রভৃতি কার্য্য সম্পন্ন হইত।' কাগজ পত্রে রাণী রাসমণি স্বয়ং সহি করিতেন। মথুরামোহন সকল কার্য্যই একরূপ সমাধা করিতেন, তবে কেবলমাত্র রাণীর সহিত পরামর্শ ও স্বাক্ষরের প্রয়োজন হইত।

বেলা দ্বিপ্রহরের সময় রঘুনাথ জীউর প্রসাদী ফলমূল প্রভৃতি আহারের পর বিশ্রাম করিতেন। অপরাহ্নে আবার বিষয়কর্ম্মের আলোচনা করিয়া

সন্ধ্যার সময় দেবার্চ্চনায় নিযুক্তা হইতেন। আর্য্য বিধবা ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিয়া এইরূপে পবিত্র পুণ্যময় জীবন অতিবাহিত করিয়াছিলেন।

রাণীর নিকট ব্রাহ্মণ পণ্ডিতবর্গের বিশেষ আদর ছিল। তিনি আর্য্য শাস্ত্রের আলোচনা ও পুঁথি পুরাণাদি পাঠ ও কথকতা শ্রবণ করিতে অত্যন্ত ভাল বাসিতেন। তাঁহার বাটিতে পণ্ডিতগণ শাস্ত্রের বিধি নিষেধাদি সম্বন্ধে সময়ে সময়ে আলোচনা করিতেন; তিনি ঔৎসুক্য সহকারে তাহা শুনিতেন ও তদনুসারে স্বীয় কর্ম্মময় জীবন অতিবাহিত করিতে চেষ্টা করিতেন। একদিন পণ্ডিতেরা কথা প্রসঙ্গে সহমরণ ও ব্রহ্মচর্য্যের শাস্ত্রীয় বিধিনিষেধ সম্বন্ধে এইরূপ আলোচনা করিতেছিলেন:—

"আর্য্য জাতির বিধিদাতা ভগবান মনু বলেন—

"মৃতে ভর্ত্তরি সাধ্বী স্ত্রী ব্রহ্মচর্য্যে ব্যবস্থিতা।
স্বর্গং গচ্ছত্যপুত্রাপি যথা তে ব্রহ্মচারিণঃ॥"

অর্থাৎ অপুত্রক হইলেও সাধ্বী বিধবা স্ত্রীগণ ব্রহ্মচর্য্য বলে ব্রহ্মচারীর ন্যায় স্বর্গে গমন করেন। অন্যান্য সংহিতাতেও ঐ ভাবের কথা আছে। সংহিতাকারগণ সহমরণ ও ব্রহ্মচর্য্য দুই পথই প্রশস্ত বলিয়া গিয়াছেন। পুরাণাদি শাস্ত্রেও উভয় পথই প্রশস্ত বলিয়া উল্লিখিত আছে। মনু-সংহিতায় ব্রহ্মচর্য্যের প্রাধান্য কীর্ত্তিত হইলেও সত্য ত্রেতা দ্বাপর যুগে সহমরণ প্রথা প্রচলিত ছিল। সর্ব্বপ্রথম যে স্বায়ম্ভুব মন্বন্তর সেই মন্বন্তরেই স্বায়ম্ভুব মনু-বংশীয় রাজচক্রবর্ত্তী পৃথুর মহিষী অর্চ্চি সহমৃতা হইয়াছিলেন। এই পৃথুর নামেই পৃথ্বী বা পৃথিবী নামের উৎপত্তি। রামায়ণে বহু সতীর সহমরণের প্রসঙ্গ আছে, কিন্তু দশরথের মৃত্যুর পর তাঁহার ভার্য্যাগণ ব্রহ্মচর্য্য ব্রত অবলম্বন করিয়াছিলেন। কৌশল্যা দেবী সহমরণের জন্য প্রস্তুত হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু সহমৃতা হন নাই। শ্রীকৃষ্ণের আট জন প্রধানা মহিষী মাত্র সহমৃতা

হইয়াছিলেন। মহাভারতে মহারাজ পাণ্ডুর উভয় পত্নীর মধ্যে কনিষ্ঠা মাদ্রী সহমৃতা হইয়াছিলেন, কিন্তু কুন্তী ব্রহ্মচারিণী হইয়া পুত্রগণের রক্ষণাবেক্ষণ ও লালন পালন করিয়াছিলেন। অনেকের মতে ব্রহ্মচর্য্যই শ্রেষ্ঠ বলিয়া বিবেচিত হয়। কেন না সহমরণাপেক্ষা ব্রহ্মচর্য্যের কঠোরতা অধিকতর। সহমরণে দেহ পুড়িয়া ছাই হইয়া যায়—পার্থিব জ্বালা যন্ত্রণা ফুরাইয়া যায়; আর ব্রহ্মচর্য্য সে হিসাবে তুষানল। ব্রহ্মচর্য্যে আজীবন জ্বালাযন্ত্রণা ভোগ করিতে হয়। ব্রহ্মচর্য্যে জগতের হিতসাধন হয়। বিধবা যদি ঐশ্বর্য্যশালিনী হন, তাঁহার ব্রহ্মচর্য্য হেতু তাঁহার ঐশ্বর্য্যের—অর্থের সদ্ব্যবহারে জগতের বহু উপকার হইতে পারে। এ সংসারে পুণ্যবতী ব্রহ্মচারিণী বিধবাদিগের দ্বারা কত সদনুষ্ঠান হইয়া থাকে তাহার কি ইয়ত্তা করা যায়? তদ্ব্যতীত যদি বিধবা পুত্রকন্যাবতী হন, আর সেই পুত্র কন্যা যদি অপোগণ্ড শিশু হয়, তাহাদিগকে সংসারে ভাসাইয়া দিয়া স্বামীর সহগমন করিলে, জননীর সন্তান পালন ধর্ম্মে বিঘ্ন ঘটে। সহ-মরণে কামনার প্রভাব, আর ব্রহ্মচর্য্যে নিষ্কাম কর্ম্মের অনুষ্ঠান।”

পতির পরলোকের পর ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিয়া রাণী রাসমণিও অন্নদান, জলদান, তীর্থ সকল পর্য্যটন, ধর্ম্মকার্য্যের অনুষ্ঠান প্রভৃতি সমাধা করতঃ পবিত্রভাবে জীবন যাপন করিয়া যে সুযশ ও সুনাম অর্জ্জন করিয়া গিয়াছেন, আজিও বঙ্গের আবালবৃদ্ধবনিতার মুখে তাহার প্রবাদ শুনিতে পাওয়া যায়। উত্তর কালে পুণ্যশীলা রাণী রাসমণি যে ভাবে দেবসেবায় মনপ্রাণ সমর্পণ করিয়াছিলেন তাহার প্রকৃষ্ট পরিচয় এখনও দক্ষিণেশ্বরে গঙ্গাতীরবর্ত্তী দেবালয়ে দেদীপ্যমান রহিয়াছে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

রথযাত্রা উৎসব।

সন ১২৪৫ সালে রথযাত্রা উৎসব করিবার জন্য রাণীর মানস হয়। তিনি তাঁহার কনিষ্ঠ জামাতা মথুর বাবুকে উহার উদ্যোগ ও আয়োজন করিতে বলেন। বাঙ্গলায় নানা স্থানে নানাপ্রকার রথ আছে কিন্তু রাণীর ইচ্ছা যে দারুময় রথ না করিয়া ধাতুময় রথ করেন। মথুর বাবুর সঙ্গে একমত হইয়া রৌপ্যময় রথ করিবার স্থির হইল। মথুর বাবু বলিলেন যে অনুমতি করেন ত বিখ্যাত জহুরী হামিল্টন কোম্পানী দ্বারা রথ প্রস্তুত করাইলেই উত্তম হয়। তাহাতে রাণী বলেন যে কেন আমাদের দেশীয় কারিগর দ্বারা রথ প্রস্তুত করান হউক, সিঁতী ও ভবানীপুরে বহু উত্তম কারিগর আছে, তাহাদিগকে বঞ্চিত করিয়া কোন বিদেশীয় কারিগর দ্বারা কার্য্য করান আমার ইচ্ছা নহে। আমাদের দেশের শিল্প কার্য্য, বিশেষ দেবতার কার্য্য, আমাদের দেশের লোকে না করিয়া বিদেশী লোকে করিবে কেন? সিঁতী ও ভবানীপুর হইতে উত্তমোত্তম কারিগরদিগকে আনাইয়া, বেতন ধার্য্য করিয়া, বাটীতে রাখিয়া কার্য্য আরম্ভ করিয়া দেওয়া হউক। তাহাই হইল; সিঁতী ও ভবানীপুর হইতে কয়েকজন ভাল ভাল কারিগর আনাইয়া শুভদিন দেখিয়া রথ প্রস্তুত করান হইতে লাগিল। সেও এক বিরাট ব্যাপার। তাহাদের বাসস্থান, আহার্য্য ইত্যাদি সকলই সরকার হইতে দেওয়া হইতে লাগিল। দুইজন ধর্ম্মভীরু, বিশ্বাসী কর্ম্মঠ কর্ম্মচারীর উপর রৌপ্য ব্যয়ের হিসাব রাখিবার ভার দেওয়া হইল। দিবারাত্র

পরিশ্রম করিয়া আষাঢ় মাসে রথ প্রস্তুত হইল। স্নান যাত্রার দিন মহাধুম ধামে রথ প্রতিষ্ঠা করা হইল। বহু ব্রাহ্মণ ভোজন ও বিদায় দেওয়া হইল। মোট ১২২, ১১৫৲ টাকা ব্যয় হইল। মহা সমারোহে মহানগরী কলিকাতার রাজপথে জন সাধারণের নয়নানন্দকর রৌপ্যময় রথ বাহির হইল। রাণীর জীবনকালে কয়েক বৎসর খুব ধূমধামে উৎসব হইয়াছিল।

গোযানে রৌসন চৌকি, সানাই, ঢাক, ঢোল, কাড়া, নাগরা, বাঁশী, জগঝম্প ইত্যাদি শতাধিক বাদ্যকরগণ শব্দে দিক মুখরিত করিয়া চলিত। শতাধিক উড়িয়া দেশবাসার সুমিলিত সঙ্গীত, তৎ পশ্চাতে বাউলের দল, যাত্রার দল, বালক সঙ্গীতের দল, সংকীর্ত্তন সম্প্রদায়, ভাঁড়ের দল, নানাবিধ রং তামাসা, পুত্তলিকার নাচনির দল; তৎপরে বাগবাজারের সখের নাম গান। বাগবাজারের হাফ্ আকড়াইয়ের দলের নাম জাদা দোহার গণ আসিতেন। ইহাদের জন্য মাসাবধি কাল পূর্ব্ব হইতে বাটীতে গান সাধা যাতায়াতের, জলযোগের, তাম্বুল, তাম্রকূট ইত্যাদির ব্যয় বহন করা হইত। তাহার পশ্চাতেই গোয়ালটুলীর সখের দলের নাম গান। মধুসূদন দাস ও লোক নাথ হোড় প্রভৃতির তত্বাবধানে এই সখের দল বাহির হইত। রথযাত্রা ও পুনর্যাত্রা উপলক্ষে প্রতিবৎসর ২॥ হইতে ৩ মণ হিসাবে যুঁই ফুলের মালা (গড়ে) খরিদ করা হইত। উহা হরি সংকীর্ত্তন ও সখের দলের গায়ক দিগকে দেওয়া হইত। তারপর রথের সম্মুখে রাণীর গুরুদেব স্বর্ণছত্র-তলে নগ্নপাদ জামাতাদিগের সমভিব্যাহারে মণ্ডলাকারে পরিবেষ্টিত, গরদ ও চেলী পরিধৃত ও উপবীতাকারে উত্তরীয় বক্ষে বিলম্বিত, বদনে কপালে চন্দন-চর্চ্চিত গলায় ফুলমালা, তুলসীমালা, স্বর্ণহার শোভিত হইয়া চলিতেন। তাহাদের পশ্চাতে নায়েব দেওয়ান, সরকার, গোমস্তা, ব্রাহ্মণ যাইতেন, সঙ্গে সঙ্গে দাসগণ আড়ানিতে ব্যজন করিতে, কায়তে

যাইতেন। তাঁহারাও নববস্ত্র পরিহিত, নব উষ্ণীষ শোভিত, হইয়া প্রসন্নমনে চলিতেন। মধ্যে মধ্যে গোলাপ-পাশ গোলাপ-বারি উদ্গীরণ করিয়া সৌরভে দিক আমোদিত ও দেহে পতিত হইয়া দেহমস্তক স্নিগ্ধ করিত। ৪।৫ শত লোক রথ রজ্জু ধরিয়া রথ বহন করিত, রঘুনাথ জীউ রথে আসীন হইতেন। তাহারই পশ্চাতে দ্বিচক্র-যান, চতুশ্চক্র-যান, ঘুড়ী চৌঘুড়ী, নানাবিধ যানে রাণীর দৌহিত্র দৌহিত্রীগণ নগ্নপাদ, নব-বস্ত্র-ফুলমালা-শোভিত, তিলক-খচিত, চন্দন চর্চ্চিত হইয়া যাইতেন। সারি সারি গোযানে করিয়া এরণ্ড তৈল, শুষ্ক নারিকেল শস্য, রাত্রে আলোকের জন্য আলোকাধার, প্রস্তুত তাম্বুল, তাম্রকূট, হুকা, গড়গড়া, ফরসী, ও একটি বৃহৎ মৃৎপাত্রে করিয়া অগ্নি বাহিত হইত। এতদর্থে ১০।১২ খানি গোযান চলিত। সকল যানের পার্শ্বেই দৌবারিক উলঙ্গ তরবার বংশযষ্টি লইয়া সাবধানে প্রহরায় নিযুক্ত। পুরোভাগ হইতে অন্তঃসীমা পর্য্যন্ত স্থূল রজ্জুবদ্ধ বংশদণ্ড সমন্বিত হরিনামাঙ্কিত লোহিত পতাকা পত পত্ রবে উড্ডীয়মান থাকিত। এইভাবে অর্দ্ধক্রোশব্যাপী পথ জুড়িয়া রথ চলিত। সঙ্গীতে, বাদ্যে,—কোলাহলে, হরিবোলে দিক মুখরিত হইত। মধ্যে মধ্যে বিরাম ও শ্রমাপোনোদন, তাম্বুল ও তাম্রকূট সেবন, নাম গান হইত, পুনরায় চলিত। রথ আয়তনে ক্ষুদ্র হইলেও চক্র চতুষ্টয় ব্যতীত সকলই রৌপ্যময়। সুতরাং অভিনব সামগ্রী দেখিবার জন্য দেশ বিদেশ হইতে লোক সমাগত হইত। তখনকার দিনে রথ-যাত্রা ও পুনর্যাত্রা উপলক্ষে অষ্টাহ কালব্যাপী উৎসবে রাণী ন্যূনপক্ষে আট হাজার টাকা প্রতি বৎসর ব্যয় করিতেন। এই উপলক্ষে আত্মীয় কুটুম্ব সকলকে বাটীতে নিমন্ত্রণ করা হইত ও পরম পরিতোষ সহকারে অষ্টাহ কাল পান ভোজনে তুষ্ট করা হইত।

এক বৎসর রাণী সহরের সম্ভ্রান্ত সাহেবদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়া

১টী ভোজ দেন ও পরিপাটী রূপে বাটী সজ্জিত করেন। সাহেব, মেম, সকলে বাটী দেখিয়া বড়ই সন্তুষ্ট হইয়া বলিয়াছিলেন—"Our eyes never met such a gorgeous, pompous extraordinary occasion like this.

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

দুর্গোৎসব।

পূর্ব্বে রাজচন্দ্র বাবুর সময়েও দুর্গোৎসব হইত; তবে রাণী বিধবা হওয়ার পর হইতে বিশেষ জাঁকজমকে ও ধূমধামের সহিত পূজা হইতে লাগিল। পূর্ব্ববঙ্গে বাণী ভবানীর দুর্গোৎসব ব্যতিবেকে দক্ষিণ-বঙ্গে রাণী রাসমণির দুর্গোৎসবেব মত দুর্গোৎসব বোধ হয় আর কোথাও হইত না। পূজার বস্ত্রাদি, ব্রতী ব্রাহ্মণদিগের জন্য গবদেব জোড়, গুরুদেব ও পুরোহিতের জন্য বেনারসি জোড়, কন্যা, জামাতা, দৌহিত্র, দৌহিত্রীদিগেব জন্য নববস্ত্র, উত্তরীয়; সরকাব, গোমস্তা নায়েব, দেওয়ান, কারকুন, চোপদার, দৌবারিক, ফরাস, ভাণ্ডারী, দাস, দাসী, পাচক, পূজারীব্রাহ্মণদিগের জন্য যথাযোগ্য বস্ত্র, উত্তবীয়, অঙ্গমার্জ্জনী, মুরাঠা, তাজ, সাটী; আত্মীয়াকুটুম্বিনীদিগের জন্য সাটী, সিন্দুর; কুমারী সধবাদিগের জন্য সাটী শাঁখা, সিন্দুর, বিদ্যার্থী ব্রাহ্মণ বালকদিগের জন্য ধুতি, উড়ানি, বহুল পরিমাণে ক্রয় করা হইত। দৌবারিকদিগেকে বকসিস দেওয়া, অধস্তন কর্ম্মচারীদিগকে প্রতিমার দক্ষিণাদানের জন্য টাকা দেওয়া হইত, দৌহিত্র দৌহিত্রীদিগকেও প্রণামী দিবার জন্য টাকা দেওয়া হইত। পূজার সময় ১০।১২ হাজার টাকা নিয়মিত বার্ষিক দেওয়া হইত। ২২।২৩ হাজার টাকায় [illegible] খরিদ করা হইত। প্রতিমার পূজায় ১০ হইতে ১৫ হাজার টাকা ব্যয় হইত। ভোজনের ব্যয়ও প্রায় ১৫।২০ হাজার টাকা সর্ব্ব সমেত মোট ৫০ হইতে ৬০ হাজার টাকা ব্যয় হইত। ৫।৭ শত সধবা দিগকে সাটী শাঁখা, সিন্দুর দেওয়া হইত। কুমারীদিগকে (সংখ্যায় ১০০০।

১২০৪ হইবে) নববস্ত্র পরাইয়া পরিতোষপূর্ব্বক ভোজন করান হইত। জগজ্জননীর আগমনে, আনন্দময়ীর অধিষ্ঠানে, দিবসত্রয় ব্যাপিয়া বাদ্যরোলে, দাসদাসীর কোলাহলে, দৌহিত্রদিগের আনন্দরোলে, ব্রাহ্মণদিগের দীয়তাং ভোজ্যতাং রবে, নিমন্ত্রিতদিগের আগমনে, বৃহৎ ভবন আনন্দ হিল্লোলে প্রবাহিত হইত। পূজার পূর্ব্ব হইতে এক পক্ষ কাল বোধন হইত; দেবীর পূজাবসানে অষ্টাহব্যাপী আমোদ ব্যসনে পর্য্যবসিত হইত। কোন দিন দাশুরথী রায়ের পাঁচালী, কোন দিন গোবিন্দচন্দ্র অধিকারীর যাত্রা, কোন দিন হাফ্ আকড়াই, কোন দিন ফুল আকড়াই, কোন দিন বালক সঙ্গীত ইত্যাদি প্রকার নানাবিধ আমোদ প্রমোদ হইত।

এক বৎসর দুর্গাপূজার সময় ষষ্ঠীর দিন প্রত্যুষে ব্রাহ্মণগণ যখন লোক জন সমভিব্যাহারে বাদ্যরোলে দিক কম্পিত করিয়া নবপত্রিকা স্নান করাইতে যাইতেছিলেন, তখন কোন সাহেব বাবুরোডের পার্শ্ববর্ত্তী অট্টালিকায় নিদ্রিত ছিলেন, তাঁহার নিদ্রায় ব্যাঘাত হওয়াতে তিনি বাদ্য শব্দ করিতে নিষেধ করেন। কে তাহা শুনে? সাহেব অচিরে পুলিসে দরখাস্ত দেন ও সঙ্গে সঙ্গে নিজে যাইয়া এ বিষয়ের প্রতিবিধান করিতে বলেন। তৎপর দিবস রাণী আরও অধিক বাদ্যকর সঙ্গে দিলেন, এইরূপে মহা আড়ম্বরে পূজা সমাধা হইল, তিন দিন কাটিল, পূজা শেষ হইলে রাণীর নিকট নিষেধ সূচক পত্র আসিল। ক্রমে মোকদ্দমা বাধিল। রাণী উত্তমোত্তম লোক বন্দোবস্ত করিয়া রাজচন্দ্র বাবুর কৃত গ্যারিজন অফিসারের মঞ্জুর করা দলিল পত্র লইয়া কোর্টে পাঠাইলেন ও বলিয়া দিলেন—"আমার রাস্তা, আমি যাহা ইচ্ছা করিব, ইহাতে সরকার বাহাদুর বাধা দিলে আমি যে ব্যয়ে রাস্তা করিয়াছি তাহার দ্বিগুণ ব্যয়ে উহার উচ্ছেদ করিয়া দিব।" তুমুল মোকদ্দমা বাধিয়া গেল। শেষ ফল হুকুম অমান্য করার জন্য রাণীর ৫০৲ টাকা জরিমানা। রাণী ছাড়িবার

পাত্র নহেন, জরিমানার টাকা দিয়াই বড় বড় গরাণ কাঠ দিয়া জানবাজারের বাটী হইতে বাবুঘাট পর্য্যন্ত রাস্তার দুই ধারে দৃঢ়রূপে বেড়া দিয়া অন্য রাস্তার যাতায়াতের পথ বন্ধ করিয়া দিলেন। সরকার হইতে কড়া তাগাদা আসিল—"বেড়া খুলিয়া লওয়া হউক।" রাণী বলিলেন—"আমার রাস্তা সরকারের প্রয়োজন হয়—আমাকে উচিত মূল্য দিলে রাস্তা ছাড়িয়া দিব, নচেৎ নহে।" মহা গণ্ডগোল বাধিয়া গেল। সারা বঙ্গে রাণীর নামে জয় জয়কার পড়িয়া গেল। তখন কোম্পানী অনুবোধ করিয়া রাস্তা খোলাইলেন। রাণীর প্রতিজ্ঞা রহিল। জরিমানার টাকা ফেরত দেওয়া হইল। রাণী ঐ রাস্তা বরাবর খাসে রাখিয়াছিলেন। এই ঘটনা লইয়া সাধারণে রাণীর নামে ছড়া বাঁধিয়াছিল ঃ—

"অষ্টঘোড়ার গাড়ী দৌড়ায় রাণী রাসমণি।
রাস্তা বন্ধ কর্ত্তে পাল্লেনা কোম্পানী।"

সকল বিবাদ মিটিয়া গেল, এই সময় হইতে সময় নির্দ্ধারিত করিয়া সরকার হইতে পাশ লইবার প্রথা হইল। ইহা হইতেই পাশের সৃষ্টি।

[illegible]ীর দিন বহু দূর দূর হইতে কুস্তিগীর আসিত। বল পরীক্ষা করা হইত। তাহাতে ১০।২০।৫০৲ এমন কি ২০০৲ টাকা পর্য্যন্ত পারিতোষিক দেওয়া হইত। জেতা ব্যক্তি যাহা পাইত পরাজিত তাহার এক চতুর্থাংশ পাইত। ঘৃত ও সিন্দূর লেপন করিয়া একটী শীর্ষবিহীন ডাব ফেলিয়া দেওয়া হইত, এবং বলে যে সকলকে পরাজিত করিয়া লইতে পারিত সে ১০৲ টাকা পুরস্কার ও একখানি বস্ত্র পাইত। সে সময়ে কত দর্শক আসিত। কত উৎসাহ লোকের মুখে দেখা যাইত। কি আনন্দের দিনই যে কালের গর্ভে লীন হইয়াছে।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

দোল ও রাসোৎসব।

.ক

রঘুনাথ জীউ ঠাকুরের দোল ও রাসোৎসব হইত যে দে দওয়া
সে বুঝিবে না, দোলের সময় কি বিরাট ব্যাপার হইত। গো লে বিদায়
বিখ্যাত গায়ক জোয়ালাপ্রসাদ আসিয়া সন্ধ্যার পর র, পূর্ব্বরাগ,
সকলকে গানে পরিতৃপ্ত ও মোহিত করিতেন। তেমন গা লকে আনন্দিত
ভারতে জন্মিবে না। একটী খেলা

দোলের দিন প্রাতঃকালে রঘুনাথ জীউকে ঠাকুর দ দিকে দুই জন
ও মঞ্চোপরি স্থাপন করা হইত। রাণীর জামাতাগণ স্নান ও পট্ট অন্যের গতি
করিয়া অগ্রে অগ্রে গঙ্গাজল বর্ষণ করিতে করিতে আসিতেন ও। জেতা
পুরোহিত ঠাকুর লইয়া আসিতেন। তাঁহার অভিষেক কার্য্য সম্প. াতের
হইলে সকলে ঠাকুর প্রণাম, ব্রাহ্মণ গুরুজনকে প্রণাম, প্রণামী প্রদান ও দোলের পার্ব্বনী লইয়া দোল খেলিত। ১০।১২টী গোযানে করিয়া পিচকারি, ফাগ, আবীর, কুমকুম, নানাবিধ চিনির খেলনা আসিত। নববস্ত্র, পার্ব্বনী, পিচকারী, রং সকলকে দেওয়া হইত। ফাগ, আবীর, কুম্‌কুম্‌, অন্দরে বাহিরে স্তরে স্তরে রাখা হইত। যাহার যত ইচ্ছা লইত, মাখিত, খেলিত, পরস্পরের অঙ্গে দিত, কাহারও নিষেধ ছিলনা। কেহ কাহাকে কুম্‌কুম্‌ মারিত, কেহ কাহাকে পিচকারি দিত, রং গোলাপজলে সিক্ত থাকাতে সৌরভে দিক আমোদ করিত। অন্তঃপুরে, বাহিরে, উপরে, নীচে, ভিত্তিগাত্রে, প্রাঙ্গণে যে দিকে দৃষ্টিপাত কর লালে লাল

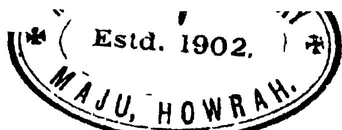
হইয়া যাইত। দোলের পর মাসাবধি কাল জানবাজারের রাস্তা লাল রঙ্গে রঞ্জিত হইয়া থাকিত। বাটীতে ভিতরে, উপরে, নীচে এত ফাগ, আবির পড়িয়া থাকিত যে সপ্তাহকাল ফাগের উপর দিয়াই সকলে যাতায়াত করিত। কেহ কেহ বা অঞ্চল ও দুকুল ভরিয়া ফাগ লইয়া যাইত। পুনঃসংস্কার না করিলে বাটী বাসোপযোগী হইত না। সর্ব্বোপরি দৌবারিকদিগের আমোদ অত্যধিক। লাল রঙ্গে রঞ্জিত হইয়া নানাবিধ বাদ্যসহযোগে গান করিত। কোলাহলে আকুল করিত। কয়েক দিবস করিয়া বাইত না। মনে হইত যেন নিবৃত্ত হইলেই রক্ষা পাওয়া যায়। ফেবত দেওয়—কেহ অভুক্ত থাকিত না। রাস্তার ধারে ধারে নানাবিধ এই ঘটনা লইয়া সামগ্রী, শিশুদিগের মন ভুলান সামগ্রীর বাজার বসিত। "অষ্ট বন্দোবস্ত ছিল।

বাস্তা দনের মত রাসের দিনেও রঘুনাথ জিউকে ঠাকুর দালানে সকল বিবা হইত। ঠাকুরের সম্মুখে নানাবিধ নয়নরঞ্জন সাজ সজ্জিত সরকার হই আলোকিত, গন্ধদ্রব্যে দেবস্থান ও অট্টালিকা আমোদিত [illegible] সম্মুখে প্রমাণ মোমের কদম্ব বৃক্ষ, তাহাতে মোমের ফুল ও ফল, হ যেন সজীব বলিয়া ভ্রম হইত। উপরে জাল দেওয়া হইত, জালে সোলার নানাবিধ কৃত্রিম পশু, পক্ষী, ফল, ফুল সজ্জিত থাকিত। উপরে ও নীচে থামের গাত্রে লাল সালু মোড়া, মকমলের ফুলগাছ, তাহাতে লৌহতার বিন্যস্ত করা; ফুল সমেত তার, মাঝে মাঝে চুমকির কাজ থাকাতে রাত্রিতে বোধ হইত যেন প্রকৃত বৃক্ষে খদ্যোত সমাবেশ হইয়াছে, দিবাভাগে খধূপ প্রকাশ পাইলে সে দৃশ্য অপসারিত হইত। হিম, বৃষ্টি, রৌদ্র জন্য আবরণ স্বরূপ উপরে পাল দেওয়া হইত। উপরে নীচে চারিদিকে নিমন্ত্রিত গণের আসনের স্থান হইত। আতর, গোলাপ, পুষ্প, মাল্য, তাম্বুল, তাম্রকূট, প্রভৃতি প্রদানে সকলকে পরিতোষ করা হইত ও

শেষ চর্ব্ব্য চোষ্য লেহ্য পেয়, সঘৃত-গোধূম-চুর্ণ-পেটিকা, দধি-দুগ্ধ-ক্ষীর, মিষ্টান্ন দ্বারা ভোজন করান হইত। বহু ব্রাহ্মণ দিগকে নিমন্ত্রণ করা হইত ও ২৲ টাকা হইতে ১৬৲ টাকা পর্য্যন্ত যোগ্যতানুসারে মর্য্যাদা ও বিদায় দেওয়া হইত। এক খানি করিয়া আসন, একটী সদ্বীপ দ্বীপাধার প্রত্যেক ব্রহ্মণকে দেওয়া হইত, তাহারা সন্ধার পর হইতে অর্দ্ধ রাত্রি পর্য্যন্ত দালানে বসিয়া রাসপঞ্চাধ্যায় পাঠ করিতেন। তৎপর এক এক জন ব্রাহ্মণকে এক একটি মৃণ্ময় পাত্রে করিয়া জলযোগার্থে মিষ্টান্ন দেওয়া হইত। তিন দিন কাল পূজা পাঠ করিয়া চতুর্থ দিনে সকলে বিদায় লইতেন। গোবিন্দ অধিকারীর এ ক্ষেত্রেও বাঁধা আসর, পুর্ব্বরাগ, মান, বিরহ, গোষ্ট, মাথুর, মিলন, একে একে শুনাইয়া সকলকে আনন্দিত করিতেন। অন্যান্য নাচ তামাসাও হইত। শেষ দিন একটী খেলা হইত, একটী বাক্সে ১০৲ ১২৲ টাকা রাখিয়া প্রাঙ্গণে দুই দিকে দুই জন সচতুর লাঠীয়াল লাঠী খেলিত, খেলিতে খেলিতে কৌশলে অন্যের গতি রোধ করিয়া যে বাক্স লইতে পারিত তাহারই জয় হইত। জেতা ব্যক্তি বাক্স সমেত মুদ্রা পাইত ও পরাজিত ব্যক্তি মাত্র যাতায়াতের পাথেয় পাইত। ইহা দেখিতে না জানি কত লোকেরই সমাবেশ হইত। দূর দূর হইতে সানাই, বাঁশের বাঁশি, শুনাইতে বহু লোক আসিত ও পুরস্কার পাইত। জন্মাষ্টমীর পর নন্দোৎসবের দিন দধিকর্দ্দমের বিশেষ আমোদ হইত। বড় বড় পালোয়ান, খ্যাতনামা কুস্তিগীর আসিত ও বল পরীক্ষা হইত।

বাসন্তী পূজায়, লক্ষ্মী পূজায়, সরস্বতী পূজায়, কার্ত্তিক পূজায়, জগদ্ধাত্রী পূজায়, সকল সময়েই সমারোহকাণ্ড ও বহু অর্থব্যয় হইত। এতদ্ব্যতীত বাটীতে উৎসব ত লাগিয়াই আছে, লোক জনের দাসদাসীর কল কল রবে, বালক বালিকাদের হাস্য ক্রন্দনের রোলে,

কর্ম্মচারীদিগের কার্য্যব্যপদেশে গমনাগমনে দ্বৌবারিকদিগের কথাবার্ত্তার বাটী সর্ব্বাদাই ক্ষুব্দ সাগর তরঙ্গবৎ প্রতীয়মান হইত। আজ প্রীতরাম বাবুর বাৎসরিক, কাল হরেকৃষ্ণ দাস মহাশয়ের বাৎসরিক, পরশ্ব রাণীর শশ্রু-ঠাকুরাণীর বাৎসারিক, তৎপরদিবস রাণীর মাতাব বাৎসরিক শ্রাদ্ধ, কোন নাসে কোন কন্যার সাধভক্ষণ, কাহারও অন্নপ্রাশন, কাহারও নামকরণ, কোন বৈবাহিকেব বাটী ভেট প্রেরণ, কোন দিন কোন সাহেবকে উপ-ঢৌকন প্রদান, কোন দিন কোন তালুক হইতে দ্রব্য সম্ভার সংগ্রহ কোন দিন রাণীর কোন তীর্থগমন ও তাহার উদ্যোগে বিরাট ব্যাপার; এইরূপে সর্ব্বদাই সকলে শশব্যস্ত থাকিত।



পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

রাণীর তীর্থগমন ও বিপদ।

সন ১২৫৭ সালে রাণীর পুরুষোত্তমে জগন্নাথ দর্শনের ইচ্ছা হয়। অনেকানেক আত্মীয়া-কুটুম্বিনী লইয়া রাণী তীর্থযাত্রা করেন। গঙ্গা উত্তীর্ণ হইয়া সাগর-সঙ্গমের মুখে আসিয়া উপনীত হইলে রাণী বলেন— 'শীঘ্র শীঘ্র বাহিয়া যাও, সময় অল্প, বকৃসিস পাইবে।' কর্ণধাব উৎসাহে উৎসাহে যাইতে লাগিল। এমন সময়ে অকস্মাৎ ঝড়বৃষ্টি আসিয়া উপস্থিত; একে ত অনন্ত জলরাশির অনন্ত উচ্ছ্বাস, কূল কিনারা নাই-- নিকটে আশ্রয় নাই, তাহাব উপর এই দুর্য্যোগ। তীরে নৌকা লাগান হইল, আবও ৩।৪ খানি নৌকা পশ্চাতে পড়িয়া আছে। মাত্র একটী দাসী ও দুইটী দ্বারবান সহিত রাণী একটু চিন্তিতা হইলেন। মনে মনে বলিলেন— 'মা জাহ্নবী, আমার অদৃষ্টে কি জগদীশ দর্শন হইবে না, তোমারই শান্ত কোলে কি আজ আমাব স্থান হইবে?' ঝড়ের ভীষণ বেগে নৌকা মগ্নপ্রায় হইল, রাণী নৌকা হইতে নামিয়া আশ্রয় অন্বেষণে ব্যস্তমনে ইতস্ততঃ চাহিলেন। দূরে একটী কুটীর দেখা গেল। রাণী দাসী সঙ্গে লইয়া উহাতেই আশ্রয় লইলেন। উহা এক ব্রাহ্মণ-পরিবাবেব পর্ণকুটীব মাত্র। পবিচয় গোপন করিয়া বাত্রে তথায় বাস করিলেন। দুর্য্যোগের কালরাত্রি প্রভাত হইল। রাণী ১০০৲ টাকা ব্রাহ্মণ পরিবারকে প্রণামী দিয়া পুনশ্চ নৌকারোহণে পুরুষোত্তম যাত্রা কবিলেন। সুবর্ণরেখার পর পারে যাইয়া দেখেন যে, পুরী গমনাগমনের ভাল রাস্তা নাই। তাঁহাব ব্যয়ে সুবর্ণরেখা হইতে পুরী পর্য্যন্ত রাস্তা প্রস্তুত কবান হইয়াছিল।

রাণী জগন্নাথ, বলরাম ও সুভদ্রা তিন জনকে তিনটী হীরকাদি-খচিত মুকুট দান করেন, আনুমানিক ঐ তিনটীর মূল্য ষাট হাজার টাকা। এক হাজার টাকা নগদ পাণ্ডাদিগকে দেন। পুরীতে একছত্র ভোজনে বিশেষ আনন্দ লাভ করেন।

তাহার পর বৎসর গঙ্গাসাগর যাত্রা করেন। সে সময়েও বহু লোক তাঁহার সঙ্গে গিয়াছিল। সেই বৎসরেই রাণী উত্তরায়ণে স্নান করিতে ত্রিবেণী যান, ত্রিবেণী হইতে নবদ্বীপ, নবদ্বীপ হইতে অগ্রদ্বীপ, এই সকল ভ্রমণ করিয়া যখন প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছিলেন, তখন সন্ধ্যার প্রাক্কালে চন্দন-নগরের সমীপবর্ত্তী গরুটীর জঙ্গলের নিকট ডাকাতের হাতে পড়েন। উহাদের বাসস্থান ঐ গৌরহাটীর বাগানের তলদেশে নিভৃত স্থানে ছিল। উহারা অকস্মাৎ ১২ জনে মিলিয়া রাণীর নৌকা আক্রমণ করিল।

রাণীর সঙ্গে দ্বারবান ছিল, উহারা লাঠী ধরিল; ডাকাত পক্ষ হইতে গুলি চলিল। রাণীর পক্ষেও বন্দুকের লক্ষ্যে দস্যুদলের ১ জন আহত হইল।

দস্যুরা বলিল,—'রাণী মা আমরা মানুষ খুন করিতে কাতর নই, কিন্তু সে জন্য আসি নাই, আমরা টাকা চাই, এখন টাকা দিবেন, না রক্তারক্তি হইবে?'

রাণী সকলকে নিরস্ত হইতে বলিয়া বলিলেন—'কত টাকা চাই, আমার কাছে ত এখন টাকা নাই, তোমরা কত জন আছ?'

উত্তর হইল—'আমরা বার জন।'

রাণী বলেন—'ভাল ১২ হাজার টাকা আমি কাল এমনি সময় এইখানে পাঠাইয়া দিব, সম্মত হও ভালই, নচেৎ আমার গলার হার ও এই রূপার সামগ্রী কয়টা আছে লইয়া যাও।'

দস্যুদল বলিল—'কাল সন্ধ্যার সময় টাকা পাই ভালই, নচেৎ রাণীমা আপনার এপথে ত্রিবেণী স্নানে যাওয়া বন্ধ হইবে।'

রাণী বলিলেন—'ভাল, কাল অপেক্ষা করিবে।'

দস্যুদল নিমিষে বনে মিশাইল। বাটী আসিয়া রাণী ১২টী তোড়ায় করিয়া ১২ হাজার টাকা নৌকাযোগে দ্বারবান দিয়া পাঠাইয়া দেন। না হইবে কেন? যাঁহার স্বামী প্রতিশ্রুতি অনুসারে হুক ডেভিডসান কোংকে ১ লক্ষ টাকা জলে ফেলিয়া দেওয়ার মত দিয়াছিলেন, তিনি যে অঙ্গীকার করিয়া ১২ হাজার টাকা দিবেন সে কথা বলাই বাহুল্য।



ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

রাণীর জন্মভূমি-দর্শন।

রাণী জীবনে অনেকবার ত্রিবেণী গিয়াছেন, এইবার ইচ্ছা হইল জন্ম ভূমি দর্শন করিবেন। ত্রিশ পঁয়ত্রিশ বৎসরের পর রাণী কোণা যাইতে স্থিরসংকল্প হইলেন। ত্রিবেণীতে স্নান করিতে যাইতেই হইবে। ফিরিবার পথে কোণা হইয়া আসিবেন। যেমন সংকল্প অমনি কার্য্যে পরিণতি। বহুকাল হইল, ক্ষেমঙ্করীও গত হইয়াছেন, রামচন্দ্র গোবিন্দ দুই ভ্রাতা রাণীর কাছেই থাকেন। জমীটুকু বৎসর বৎসর খাজনা দিয়া রাখা হইয়াছে বটে, কিন্তু গৃহাদি কিছুই নাই। রাণী কিছু টাকা ও দুইজন লোক পাঠাইয়া দিলেন, অস্থায়ীভাবে ২।৩ রাত্রি সেখানে বাসোপযোগী গৃহ নির্ম্মাণ করিতে আদেশ দিলেন। বড়ই আক্ষেপের বিষয়, এত স্থানে রাণী এত কীর্ত্তি করিলেন, কিন্তু পিতার বাস্তু ভিটায় মাত্র একখানি পোড়া মাটীর ঘর যদি থাকিত, যেন কতই আনন্দের বিষয় হইত; কিন্তু তাহা হয় নাই। কেন হয় নাই তাহার তথ্যও পাওয়া যায় না। রাণীর আদেশ মত দুইখানি মৃৎরচিত গৃহ নির্ম্মিত হইল। রাণী উত্তরায়ণে ত্রিবেণীতে স্নান করিয়া নিজ পিত্রালয়ে আসিলেন। হালি-সহর, কোণা, কাঞ্চনপল্লী, মালঞ্চ, জোঠ, বিজনে, হাজিনগর, নৈহাটী, কাঁঠালপাড়া, হুগলী, বংশবাটী, বন্দেল, বালী ইত্যাদি দূরবর্ত্তী নিকট-বর্ত্তী ও গঙ্গার উভয় তীরবর্ত্তী বহুলোক রাণীকে দেখিতে আসিল। রাণীও সকলকে দর্শন দিলেন। পিতৃভূমি দর্শন করিয়াই মাতার স্নেহ, পিতার মুখ, পিসিমাতার আদর, বাল্যসখীদিগের প্রণয় সকলই একে একে মনে

পড়িতে লাগিল। রাণী বালিকার মত কিছুক্ষণ কাঁদিলেন। শান্ত হইলে বহু ব্রাহ্মণ, বৃদ্ধ, বৃদ্ধা, প্রতিবেশী, আসিয়া কথাবার্ত্তা কহিতে লাগিল। রাণী বাল্যকালের সখীদিগকে দেখিয়া বিশেষ আনন্দ পাইলেন। তাহার পর কাহাকেও অর্থ, কাহাকেও বস্ত্র, কাহাকেও আহার, কাহাকেও ঋণমুক্তি, কাহার নবজাত শিশুকন্যাদিগকে উপঢৌকন, কোন নববিবাহিত বর-বধূকে যৌতুকদান, গ্রাম্য অন্ধ-আতুর-উপায়হীনদিগকে অর্থ সাহায্য করিলেন। সধবা বিধবা, ব্রাহ্মণ শূদ্র, বালক বালিকা সকলেই রাণীর আদর পাইল। সকলেই আসিল, আসিল না কেবল বৃন্দাবন ঘোষের কন্যা। সংবাদ অবশ্যই সে জানিত; ভিতরে কিছু কারণ ছিল।

বৃন্দাবন ঘোষ জাতিতে সদ্গোপ, কন্যার নাম তরুলতা, সে রাণীর বাল্যের খেলার সঙ্গিনী। রাণী তাহার সংবাদ লইয়া জানিলেন যে, সে সধবা ও পিতৃগৃহে আছে। রাণী লোক দ্বারা বলিয়া পাঠাইলেন যে, যদি তুমি আমার সঙ্গে না দেখা কর, তবে আমিই তোমার বাটী যাইব। এই কথা শুনিয়াই তরুলতা রাণীর নিকট আসিলে, দুইজনেই কাছে বসিয়া প্রেমাশ্রু বর্ষণ করিতে লাগিলেন।

পরে রাণী জিজ্ঞাসা করিলেন, 'সকলেই শুনিয়াছে যে আমি আসিয়াছি, আর তুমিও শুনিয়াছ; কিন্তু তুমি কেন আইস নাই?'

তরুলতা লজ্জায় যেন মরিয়া গেল। প্রথমে অনেক আপত্তি করিল, শেষে বলিল,—'মা বলিয়াছিলেন, রাণীদের বাড়ী যাস্ না বা রাণীর সহিত খেলিস্ না।'

রাণী শুনিয়া অবাক্! কারণ কি জিজ্ঞাসিলেন। তরুলতা বলিতে চাহে না, শেষ বলিল—'তোমার আমার এক দিন খেলিয়া আসিতে রাত হয়, তাহাতে তোমার পিসি মা বলেন যে, এত রাত করা কি ভাল, তুমি আর রাণীর সহিত বেড়াইতে বা খেলিতে আসিও না।

এ কথা মা শুনিয়া আমায় বারণ করিয়াছিলেন। তার পর তোমার বিবাহ হইল।' তুমি দেশ ছাড়িয়া গেলে।'

'তবে যে আজ আসিলে?'—রাণী হাসিয়া এই কথা বলিলেন।

তরুলতা বলিল,—'থাকিতে পারিলাম না, আমারও একটু অভিমান' হইয়াছিল যে রাণী না ডাকিলে যাইব না।'

রাণী বলিলেন—"ভালই হইল, তুমি না আসিলে আমি যাইতাম, আসিয়াছ তবুও যাইব। মার কাছে মাপ চাহিতে হইবে। এ কাজটা করাই চাই।"

তখনই দুইজনে চলিলেন। তরুলতার মাতা বৃদ্ধা হইয়াছেন, পিতা গত হইয়াছেন, মাতার সহিত সাক্ষাতে ২।৪ দুই চারি কথায় আনন্দের প্রবাহ বহিল। রাণী মাপ চাহিলেন। তরুলতাকে অর্থবস্ত্রাদি দিয়া, তাহার মাতাকে একখানি মূল্যবান পট্টবস্ত্র ও কিছু অর্থ দিয়া ত্রিরাত্রি বাসের পর রাণী বিদায় লইলেন। বিদায়ের কালে গ্রামের কয়েকজন ব্রাহ্মণ বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠে উপবীত সংলগ্ন করিয়া আন্তরিক আশীর্ব্বাদ জ্ঞাপনপূর্ব্বক রাণীকে বলিলেন যে, পুণ্যবতী আমাদের সকলের স্নানের বড় অসুবিধা—গঙ্গায় একটি ঘাট করিয়া দিতে আমরা সকলে একবাক্যে অনুরোধ করিতেছি। তোমারই পিত্রালয়ে তোমার কীর্ত্তি থাকিয়া জনসাধারণের উপকার করুক।—রাণী তখনই ২৫ হইতে ৩৫ হাজার টাকা মঞ্জুর করিলেন। ঘাট নির্ম্মাণ হইলে তাহাতে তাঁহার মাতৃনাম খোদিত রহিল। এই সময়ে হুগলী নিবাসী কতিপয় লোক হুগলীতে একটী স্নানের ঘাট দিবার প্রস্তাব করেন। রাণী তাহাতেও সম্মত হয়েন। বাবুগঞ্জের নিকটেও রাণী রাসমণির ঘাট আছে।

তথা হইতে রাণী বংশবাটী হংসেশ্বরী দর্শন করিতে যান। হংসেশ্বরীর মন্দির অতীব বিচিত্র কৌশলে নির্ম্মিত হইয়াছে। রাণী তাহা দেখিয়া রাণ[illegible]র সঙ্গে দেখা করিতে যান। রাণী শঙ্করী

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

রাণীর নবদ্বীপযাত্রা মহোৎসব ও ব্রাহ্মণদিগকে দান।

রাণী একবার শ্রীচৈতন্যদেব দর্শন, মহোৎসব ও পণ্ডিত মণ্ডলীকে দান করিবার ইচ্ছা করিয়া নবদ্বীপ যাত্রা করিলেন। সঙ্গে মথুর বাবু, দাস, দাসী, দ্বারবান, গোমস্তা ও বহু দ্রব্য সম্ভার লইয়া গেলেন। যিনি প্রেমের অবতার, হরিনাম দিয়া জীবের মুক্তির সহজ উপায় করিয়া দিয়াছেন, পুণ্যধাম নবদ্বীপে আসিয়া সেই শ্রীচৈতন্যদেবের মূর্ত্তি দর্শন করিয়া বৈষ্ণব সম্প্রদায়কে মহোৎসবে পরিতুষ্ট করেন। তৎপর পাঁচ শত জোড়া গরদের জোড় আনাইয়া প্রত্যেক ব্রাহ্মণকে তাহার এক এক থানি, পাঁচটী টাকা ও একটী নূতন কলসী দান করেন। এই উপলক্ষে প্রায় সাতদিনে ২০ হাজার টাকা দান দেওয়া হইল। তার পর সেই সময়ে গ্রহণ হওয়াতে রাণী স্নান করিয়া ৫।৬ হাজার টাকার চাউল, ডাউল, বস্ত্র, উত্তরীয়, মিষ্টান্ন, তাম্রমুদ্রা, রৌপ্যমুদ্রা ইত্যাদি দান করেন। সে সময়ে রাণীর নাম বঙ্গে যথা তথা ভূয়সী প্রশংসার সহিত কীর্ত্তিত হইতে লাগিল।

মুর্শিদাবাদে যেমন জগৎশেঠের নাম, পূর্ব্ববঙ্গে যেমন অর্দ্ধবঙ্গেশ্বরী রাণী ভবানীর নাম, বঙ্গদেশের রাণাঘাটে যেমন পাল চৌধুরীদিগের পূর্ব্ব পুরুষদ্বয়, কৃষ্ণরাম পান্তি ও শম্ভুচন্দ্র পান্তির নাম একদিন ঘরে ঘরে মুখে মুখে শুনা যাইত, এই সময়ে রাণীর নামও ঘরে ঘরে মুখে মুখে শুনা যাইত। না হইবে কেন? যাঁহার সারা বঙ্গে দানের ইয়ত্তা নাই, তাঁহার নাম না হইবে কেন?

তুমি যে হও স্ত্রী বা পুরুষ যেই হও জগৎ যখন তোমাকে সাদর আহ্বান করিয়াছে, তুমি যখন জীবমঙ্গলের হেতু হইয়া মঙ্গলময়ের কার্য্যসাধন জন্য জন্মিয়াছ ও কার্য্য করিতেছ, তখন জগৎ তোমার ধন্যবাদ না করিয়া স্থির থাকিতে পারে ?

রাণী বাটী আসিলেন। দীর্ঘ চারি বৎসর তীর্থপর্য্যটন করিয়া বহুল অর্থ ব্যয় করিয়া, আনুমানিক চারি পাঁচ লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়া বাটী আসিলেন।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

গঙ্গার জলকর রহিত করণ ও ব্রাহ্মণের কন্যাদায় উদ্ধার।

এ সময়ে ধীবরকুল গঙ্গায় জাল ফেলিয়া মৎস্য ধরিত বলিয়া গবর্ণমেণ্ট তাহাদেব কর ধার্য্য করিলেন। রাজা রাধাকান্ত দেব প্রভৃতির নিকট ধীবরগণ সাহায্য প্রার্থনা করিয়া অকৃতকার্য্য হইয়া সকলে রাণীর নিকট আসিয়া কাঁদিয়া ইহার প্রতীকার প্রার্থনা করিল। রাণী তাহাদিগকে আশ্বস্ত করিয়া গবর্ণমেণ্ট হইতে, ঘুষুড়ির নিকট হইতে মেটিয়া বুরুজেব সীমা পর্য্যন্ত গঙ্গা ১০ হাজার টাকায় জমা লইয়া দড়ী দিয়া বংশদণ্ড বন্ধনে ঘেরিয়া দিলেন। ধীবরেরা মৎস্য ধরিতে লাগিল। কোন জাহাজ নৌকা জলপথে যাতায়াত নিষেধ হইল।

গবর্ণমেণ্ট পক্ষ হইতে রাণীর নিকট তলব আসিল, জলপথ মুক্ত করিয়া দেওয়া হউক ও সাধারণের ও সরকারি মালামাল যাতায়াতের অসুবিধা জনক জলপথ বন্ধ করার কারণ দর্শান হউক। রাণী লোকদ্বারা বলিয়া দিলেন যে, আমি কর দিয়াছি, সুতরাং ন্যায়তঃ আমি ঐ পথ রোধ করিতে পারি। আমার প্রজাদের অসুবিধা হইতেছে; বাষ্পীয় পোতের গমনাগমন বশতঃ মৎস্য ইতস্ততঃ ধাবিত হইতেছে ও ডিম্ব সকল নির্গত হইতেছে; সুতরাং আমার প্রজাদের বিশেষ ক্ষতি হইতেছে। শেষে অনেক তর্কবিতর্ক বিচারের পর রাণীর টাকা ফেরত দেওয়া হইল ও ধীবরগণকে নিষ্করে মৎস্য ধরিতে অনুমতি দেওয়া হইল। রাণী জলপথ মুক্ত করিয়া দিলেন। বাঙ্গলায় রাণীর নামে আর একবার

জয় জয়কার পড়িয়া গেল, সেই সময়ে রাণীর নামে যে একটি গীত রচিত হইয়াছিল ও যাহা মুখে মুখে গীত হইয়া দেশে বিদেশে যাইত, তাহা নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

"ধন্য রাণী রাসমণি রমণীর মণি।
বাঙ্গলায় ভাল যশ রাখিলে আপনি॥
দীনের দুঃখ দেখে কাঁদিলে আপনি।
দিয়ে ঘরের টাকা পরের জন্যে বাঁচালে প্রাণী॥
যে যশ রাখিলে তুমি হইয়ে রমণী।
ঘরে ঘরে তোমার নাম গাইব দিবস রজনী॥"

গঙ্গার জলকর রহিত হইয়াছে। এই সময় এক ব্রাহ্মণ রাণীর নিকট কন্যাদায়গ্রস্ত হইয়া আসেন ও অর্থ-ভিক্ষা করেন, রাণীর মনে করুণার সঞ্চার হয় ও জিজ্ঞাসা করেন যে কত ব্যয় হইবে। ব্রাহ্মণ বলেন— দুইটী কন্যা বয়স্থা ও পাত্রস্থা করিবার যোগ্যা হইয়াছে, আমার সামর্থ্য নাই যে তাহাদের শুভকার্য্য সমাধা করি, ন্যূনকল্পে ১ হাজার টাকা ব্যয় হইবে। রাণী বলেন—'ভাল আমি লোক দিতেছি ও টাকা দিতেছি সঙ্গে লইয়া কন্যাদ্বয়ের বিবাহ কার্য্য সমাধা করুন।' কথা মত ১৫০০ টাকা দিয়া রাণী একজন বিশ্বস্ত সরকারকে ব্রাহ্মণের বাটী পাঠাইয়া দিলেন; যথার্থই ব্রাহ্মণের দুইটী কন্যার বিবাহ দেওয়াতে প্রায় ২২০০৲ টাকা ব্যয় হইল। ব্রাহ্মণ আন্তরিক আশীর্ব্বাদ করিলেন। সরকার ৩।৪ শত টাকা লইয়া ফিরিয়া আসিয়া সমস্ত জ্ঞাপন করিলে রাণী বিশেষ অসন্তুষ্ট হইলেন এবং বলিলেন যে, ঐ টাকা সমস্তই ব্রাহ্মণকে দাও আরও বক্রী টাকা ব্রাহ্মণকে পাঠাইয়া দাও। তাহাই হইল। বহু বৎসর পরে ঐ ব্রাহ্মণের বংশের ১টী বালক পঠদ্দশায় রাণীর বাড়ীতে থাকিয়া উত্তর কালে শিক্ষিত হইয়া উপার্জ্জনক্ষম হইয়াছিলেন ও মধ্যে মধ্যে

আসিয়া কৃতজ্ঞতা স্বরূপ রাণীর বংশধরগণের নিকট জানাইতেন যে রাণীর অন্নে, রাণীর দয়ায় তিনি উন্নত হইতে পারিয়াছেন। এমন একজন কেন, অনেকেই আহার, বিদ্যালয়ের বেতন, পাঠ্যপুস্তকের মূল্য, বস্ত্রাদি পাইয়াছেন। অদ্যাবধি অনেক ব্রাহ্মণ-সন্তান রাণীর বংশধরগণের নিকট হইতে প্রতিপালিত হইতেছেন। জনৈক ব্রাহ্মণ-সন্তান বাদ্যশিক্ষা করিয়া উত্তম বাদক হইয়াছেন ও সঙ্গীতের সঙ্গে তান লয় সহকারে বিশুদ্ধ-ভাবে বাজাইতে শিখিয়াছেন।

নবম পরিচ্ছেদ।

সিপাহী-বিদ্রোহ ও রাণীর উপঢৌকন-প্রেরণ।

সহসা ভারতবর্ষে অগ্নি জ্বলিয়া উঠিল। কাশ্মীরের প্রান্তসীমা হইতে দক্ষিণ বঙ্গের শেষ সীমা পর্য্যন্ত বিদ্যুদ্বেগে প্রচারিত হইল, কাণপুরে সিপাহীরা বিদ্রোহী হইয়াছে। ইতিহাসবিদ্ জানেন যে ইহার কারণ কি? টোটায় শূকরের ও গাভীর চর্ব্বি মিশ্রিত আছে ও সেই টোটা দন্ত দ্বারা ছিন্ন করিয়া বন্দুকে দিতে হইবে। সিপাহিরা এমন কাজ করিবে কেন? সুতরাং তাহারা বিদ্রোহী হইল। ইংরাজ দেখিলেই হত্যা করিতে লাগিল ও দলবদ্ধ হইয়া লুটপাট করিতে লাগিল। যখন কাণপুরের সিপাহীদিগের পৈশাচিক অভিনয় হইতেছিল সেই সময়ে ইংরাজ বন্ধু, অদ্বিতীয় বীর, নেপাল-মন্ত্রী পৃথিবী-বিক্রম জঙ্গ বাহাদুর, সসৈন্যে যাইয়া ইংরাজদিগকে সাহায্য করেন। রসদ, আগ্নেয়াস্ত্র, বন্দুক, তরবারি, বারুদ গুলি গোলা দিয়া সাহায্য করেন। রাণী রাসমণির নিকট সংবাদ পৌঁছিলে তিনি কি করা কর্ত্তব্য স্থির করিতে লাগিলেন। যাঁহারা হিতৈষী তাঁহারা বলিলেন—'কোম্পানীর কাগজ বেচিয়া ফেলা হউক, কোম্পানীর রাজ্য ত গেল'। রাণী অনেক গবেষণার পর বলিলেন।—'কিছুই হইবে না, মাত্র লোকক্ষয় হইবে, কোম্পানীর রাজত্ব থাকিবে। আমার ইচ্ছা আমরা যখন ইংরাজের প্রজা তখন কিছু উপঢৌকন দেওয়া যাউক।' তাহাই হইল—নিম্নলিখিত দ্রব্যসম্ভার ইংরাজগণের, সাহায্যের নিমিত্ত প্রেরণ করা হইল।

হাতী	২টী	পাকা তুম্বা	১০০০
ঘোটক	৪০ ,,	বিস্কুট	১০/০ মণ
ভেড়া	৬০ ,,	কম্বল	১০০ থান
ছাগল	১০০ ,,	হাঁসের ডিম,	১০০০টী
আটা	৫/ মণ	মুরগির ডিম	৫৯৮টী
ছোলা	৫/ "	লবণ	১০/ "
পাকা কলা	৫০ কাঁদী	হাঁস	৫০ টা
চাউল	১০/ "	মুরগী	৫০ টা

এই সময়ে রাণী নিজবাটীতে গোরা প্রহরীর বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন কাণপুর বিজয়ের পর রাণীর উপর ইংরাজেরা বিশেষ সন্তুষ্ট হন।

দশম পরিচ্ছেদ।

গোরার উৎপাত।

এই সময়ে জানবাজারের বাটীতে একটি বড়ই লোমহর্ষণ ব্যাপার ঘটিল। সিপাহী-বিদ্রোহ অনল নির্ব্বাপিত হইয়াছে। কতকাংশে উত্তর ও পশ্চিম বাঙ্গলায় শান্তি স্থাপিত হইয়াছে। তখন আনুমানিক ২০০।২৫০ শত (undisciplined soldiers) অশিক্ষিত সৈন্য ফ্রি স্কুলে বাস করিত। তাহাদের একজন (Officer Commanding) অধিনায়ক ছিলেন। সেই সকল সৈন্যেরা বড়ই দুর্দ্ধর্ষ ও অবাধ্য ছিল। সম্প্রতি তাহাদের কোন কার্য্য না থাকাতে যদৃচ্ছা ভ্রমণ করিত ও সুবিধা পাইলেই বল প্রকাশ দ্বারা পথিকদিগের সর্ব্বস্ব অপহরণ করিত। দুই তিন জনে একজন পথিককে বলপূর্ব্বক চাপিয়া ধরিত ও দুই এক জনে তাহার নিকট যাহা পাইত অপহরণ করিত। সমস্ত দিবাভাগ ও রাত্রি এক প্রহর দেড় প্রহর পর্য্যন্ত তাহারা স্থানে স্থানে দলবদ্ধ হইয়া জানবাজারের রাস্তায় ফ্রি স্কুল ষ্ট্রীটে বিচরণ করিত। কোথাও মোদক-বিপণীতে আহারীয় মিষ্টান্ন সজ্জিত রহিয়াছে, হঠাৎ তাহাই লইয়া পলায়ন করিত। কোথাও ব্যবসায়ী অন্যমনস্কভাবে আছে তাহার তহবিল লইয়া পলাইত। যখন এইরূপ ব্যাপার চলিতেছিল, তখন এক দিন জানবাজারের বাটীর সম্মুখে জনৈক পথিককে ধরিয়া তিন চারি জন মাতাল সৈনিক বল প্রয়োগ করিতেছিল। 'রাণী-রাসমণি-কুঠী'র ছাদে রাণীর জামাতাগণ বৈকালিক ভ্রমণ ও পাদচারণ করিতেছিলেন। তখন সায়াহ্ন। এ দৃশ্য তাঁহাদের অসহ্য হইল। তাঁহারা উপর হইতে দ্বারবানদিগকে হুকুম দিলেন—"লাগাও"

অর্থাৎ মার। যেমনি হুকুম অমনি তামিল হইল, দ্বারবানেরা বড় বড় পাকা বাঁশের লাঠীর সদ্ব্যবহার করিল। ইত্যবসরে উপর হইতে জামাতা বাবুরা ফুলগাছে জল দিবার বৃহৎ মৃণ্ময় জলাধার জল-শূন্য ও ভগ্ন করিয়া উপর হইতে নিক্ষেপ করিলেন। তাহার ফলে জনৈক সৈনিকপুরুষের মস্তক আঘাত প্রাপ্ত হইয়া রক্ত পড়িতে লাগিল। উহারা ফ্রী স্কুলে যাইয়া তাহাদের দলে সংবাদ দিল ও প্রায় ৫০।৬০ জন একত্রিত হইয়া উন্মুক্ত করবাল-করে রাণীর বাটীর সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইল। তখন দ্বারবানেরা বৃহৎ লৌহ কবাট বন্ধ করিয়া দিয়াছে। ক্রোধিত প্রতিহিংসা-পরায়ণ মত্ত সৈনিকগণ অন্য উপায় না দেখিয়া সম্মুখে একটী অর্দ্ধভগ্ন কাষ্ঠাসন ছিল তাহা দ্বারা বৃহদ্বারের বক্ষে যে ক্ষুদ্র দ্বার ছিল তাহা ভাঙ্গিয়া ফেলিল ও ভিতরে প্রবেশ করিয়া দ্বারমুক্ত করিয়া দিল এবং সকলে একে একে আসিতে লাগিল। কুক্ষণেই শর্ব্বরী প্রভাত হইয়াছিল। প্রথম প্রথম কয়েকজন সাহসী ও বলী দ্বারবানেরা বাধা দিল, শেষ বিবাদের অবস্থা ও বিপক্ষদল সুসজ্জিত ও রণ-নিপুণ দেখিয়া অদৃশ্য হইল। নিমেষে রাণীর নিকট সংবাদ গেল, কন্যা জামাতা দৌহিত্র ও দৌহিত্রী সকলে পশ্চাদ্বার দিয়া মান্না বাবুদের বাটীতে সরিয়া গেলেন। কেবলমাত্র রাণী, বস্ত্র সংযত করিয়া, উলঙ্গ কৃপাণ করে ভৈরবী মূর্ত্তিতে ঠাকুর রঘুনাথ জীউর গৃহে একটি দ্বার উন্মুক্ত ও একটী বন্ধ করিয়া ঘরের মধ্যে রহিলেন। ছাদের উপরে গ্রন্থকারের খুল্ল পিতামহ তাঁহার ১॥ বৎসর বয়স্ক ১ম পুত্রকে ক্রোড়দেশে ধারণ করিয়া দণ্ডায়মান ছিলেন ও গোবিন্দ নামক জনৈক বিশ্বস্ত ভৃত্য বাটীর ভিতর ছিল। অবারিত দ্বার পাইয়া ক্রোধোন্মত্ত সৈনিকদল বাটিতে প্রবেশ করিতে লাগিল। নিম্নে যুগ্ম ময়ুর ময়ুরী ছিল তাহাদের উপর তরবারির

আঘাত করিতে গেলে, তাহারা স্থানান্তরে উড়িয়া গেল। নিকটেই যুগ্ম হরিণ-হরিণী ছিল, তাহাদিগকে কাটিয়া ফেলিল। নিম্নতলে বিশেষ কিছু ছিল না; উপর তলে আসিলেই দেখিল, সকল গৃহের দ্বার উন্মুক্ত; কি অন্দর-মহলে কি সদরে সকল স্থানই জনমানব-শূন্য—অবারিত। উপরে বৈঠকখানায় ৫২ ডালির ঝাড় ছিল, অস্ত্রাঘাত করিতেই ঝন্ ঝন্ শব্দে জগতের নশ্বরতা জ্ঞাপন করিয়া ভাঙ্গিয়া গেল। গৃহ-প্রাচীরে বিলম্বিত মুকুর চূর্ণ করিয়া দিল। শয্যাবরণ তুলিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিল, উপধান নষ্ট করিল; সেজ, দেওয়ালগিরী, বর্ত্তিকাধার সমস্তই চূর্ণ বিচূর্ণ করিয়া ফেলিল। একদিকে বাদ্যযন্ত্রগুলি সজ্জিত ছিল, তাহাও নষ্ট করিল। পুষ্পবৃক্ষ সকল ভ্রষ্টশ্রী করিয়া দিল। এইবার অন্তঃপুরে প্রবেশ করিল; রাণীর গৃহের মুকুর, আলেখ্য চিত্রপট, শয্যাস্তরণ সকলই নষ্ট করিল। এক ছড়া মুক্তার মালা ছিল, পাষণ্ডেরা তাহা পদদলিত করিল; এক গাছি স্বর্ণহার ছিল, ছিঁড়িয়া দিল। রাণীর প্রিয় পক্ষীগুলির কাহারও পক্ষচ্ছেদন, কাহারও পদচ্ছেদন, কাহারও দেহ হইতে মস্তক বিচ্যুত করিয়া দিল ও তাহারা দাঁড়েই ঝুলিতে লাগিল। রূপার তৈজস পত্র ভাঙ্গিয়া ফেলিল। খুঁজিতে খুঁজিতে গোবিন্দ নামক ভৃত্যকে দেখিতে পাইয়া তাহার মেরুদণ্ডে তরবারির আঘাত করিল। সে সংজ্ঞাশূন্য হইয়া পড়িয়া রহিল। সৌভাগ্যক্রমে রাণীর দিকে কেহই অগ্রসর হয় নাই। রঘুনাথ জীউ সে যাত্রা রক্ষা করিলেন। রাত্রি ১০টা পর্য্যন্ত এইরূপ লোমহর্ষণ পৈশাচিক অভিনয় চলিতে লাগিল। মথুর বাবু বাটী ছিলেন না, তাঁহার গাড়ী বাটী আসিলেই জনৈক দ্বারবান সংবাদ দিল, তিনি তৎক্ষণাৎ কলিঙ্গা বাজারে যাইয়া ইনস্পেক্টরকে সঙ্গে লইয়া তাহাদের স্ত্রীস্কুলের আবাস-মন্দিরে গেলেন এবং অধিনায়ক (Officer commandnig) ও কতিপয় সৈন্য-গণকে সঙ্গে লইয়া বাটী আসিলেন। তাহারা আসিয়াই নিম্নতলে দাঁড়াইয়া

তূর্য্যধ্বনি করিলেই সকলে একে একে সংযত হইয়া নামিয়া আসিতে লাগিল। নিম্নতলে ফিরিবার পথে একটী মনোরম কুকুর ভীতত্রাস্ত হইয়া ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতেছিল। নিমেষে তরবারির আঘাতে সে দ্বিখণ্ড হইল। অধিনায়ক সাহেব উপরতলে যাইয়া সকলকে ফিরিয়া যাইতে আদেশ দিলেন। এইরূপে সে দিনের উৎপাত থামিল বটে, কিন্তু ভবিষ্যতে উৎপাতের আশ-ঙ্কায় তাহার পর ২ বৎসর কাল যাবৎ রাণী ১২ জন গোরা সৈনিক সদা সর্ব্বদা বাটীতে প্রহরায় নিযুক্ত রাখেন, সুখের বিষয় ইহার পর আর কোন গোলমাল হয় নাই। ইতাতেও তিনি সন্তুষ্ট হন নাই, তাঁহার যে সব আসবাব নষ্ট হইয়াছিল, সে সমস্তের ক্ষতিপূরণ বাবত সমস্ত টাকা সরকার হইতে আদায় করিয়াছিলেন।

একাদশ পরিচ্ছেদ।

নীলকর দমন, জগন্নাথপুরে অত্যাচার নিবারণ, টোনার খাল খনন ও দক্ষিণেশ্বর-প্রসঙ্গ।

বিষয় ও সাধনা।

রাণীর জমিদারী মকিমপুর পরগণায় নীলকরের উৎপাত হয়। উৎপীড়িত প্রজার কষ্ট শুনিয়া রাণী পঞ্চাশজন দ্বারবান পাঠাইলেন এবং স্বাক্ষরিত পত্র দ্বারা নায়েবকে উপদেশ দিলেন, অত্যাচারী নীলকর সাহেবকে সমুচিত শাস্তি দিবে। নীলকর ডোনাল্ড যে উত্তম মধ্যম শিক্ষা পায় তাহাতে মৃতপ্রায় হয়। আদালতে মোকদ্দমা রুজু হয়; কিন্তু ডিশমিশ হইয়া যায়। সেই অবধি সেখানে নীলকরের উৎপাত স্থগিত হইল।

রাণীর জগন্নাথপুর তালুকের চতুর্দ্দিকেই নড়াইল-জমিদার-বংশের প্রতিষ্ঠাতা রামরতন রায় মহাশয়ের জমিদারী, জগন্নাথপুর তালুকটীও যাহাতে তাঁহার দখলে আসে, এই তাঁহার ইচ্ছা। তিনি সেই অভিলাষে রাণীর তথাকার কর্ম্মচারীবর্গ ও প্রজাগণের উপর অমানুষিক অত্যাচার আরম্ভ করেন। প্রজার সর্ব্বস্ব অপহরণ, গৃহদাহ, নরহত্যা প্রভৃতি নানা পৈশাচিক ঘটনার অভিনয় হইতেছিল। রাণী লোকজন পাঠাইয়া প্রতীকারের ব্যবস্থা করিলেন। মহাবীর নামক সর্দ্দারপুঙ্গবের নেতৃত্বে বহু লাঠিয়াল প্রজাগণের সহায়স্বরূপ জগন্নাথপুর তালুকে প্রেরিত হইল।

মহাবীর যেমন শক্তিশালী পুরুষসিংহ, তেমনই গম্ভীর-প্রকৃতি ও সদাশয় ব্যক্তি ছিল। সে অন্যায়রূপে কোন দাঙ্গা হাঙ্গামায় কখনও লিপ্ত হইত না। মহাবীরের আগমনে অত্যাচার নিরস্ত হইল; রামরতন বাবুর লোকজন ভয় পাইয়া সরিয়া গেল বটে, কিন্তু গুপ্ত ষড়যন্ত্রের হস্ত হইতে মহাবীর আত্মরক্ষা করিতে সমর্থ হইল না। মহাবীর নির্দ্দয়রূপে আততায়ীর অস্ত্রের গুপ্ত আঘাতে প্রাণত্যাগ করিল! মহাবীর রাণীর জামাতা মথুরবাবুর বিশেষ প্রিয় লাঠিয়াল ছিল; তাহার মৃত্যুতে রাণী ও মথুরবাবু ব্যথিত হইলেন।

জগন্নাথপুরস্থ রাণীর নায়েব মহাবীর-হত্যার প্রতিশোধ, গৃহদাহ-জনিত প্রতিহিংসা, অর্থব্যয়-সংক্রান্ত ক্ষতিপূরণ ইত্যাদি ভাবিয়া বিপক্ষের উপর প্রচণ্ডবেগে নিপতিত হইবার জন্য আয়োজন করিতেছিলেন। ২৪ পরগণা, বর্দ্ধমান, হুগলী ও অন্যান্য স্থান হইতে বাছা বাছা লাঠিয়াল, পাইক, সড়্কী-ওয়ালা, ফিঙ্গেওয়ালা; পাপড়ীবাজ সংগ্রহ করা হইয়াছিল। টাঙ্গী, বল্লম, বর্শা, লাঠি, সড়্কী, কুঠার, খোঁচ প্রভৃতি অস্ত্রশস্ত্র লইয়া কৃষ্ণকায় ভীষণাকার লোক সমূহ "রাণী মায়ের জয়" "জয় রাণী রাসমণির জয়" রবে দিক বিকম্পিত করিয়া তুলিতে লাগিল। রামরতন বাবুও অবস্থা বুঝিয়া দাঙ্গার জন্য প্রস্তুত হইতেছিলেন; কিন্তু "রাণী মায়ের জয়" এই ভীষণ হুঙ্কারে তাঁহার লোকজন স্তম্ভিত হইয়াছিল—অগ্রসর হইতে পারে নাই। শেষে রাণীর নিকট হইতে আদেশ আসিল যে, অনর্থক দাঙ্গা-হাঙ্গামার প্রয়োজন নাই। কেবলমাত্র আমার কর্ম্মচারী ও প্রজাবর্গের উপর কেহ অত্যাচার করিতে না পারে, এইরূপে আত্মরক্ষার জন্য যতটুকু দরকার, ততটুকুই যথেষ্ট। নায়েব তাহাই করিলেন। দাঙ্গা-হাঙ্গামা কিছুই হইল না। রাণী মোকদ্দমা রুজু করিলেন। দুই বৎসর মোকদ্দমা চলিয়াছিল, তাহাতে রাণীই জয়ী হইয়াছিলেন। এখনও যশোহর, রঙ্গপুর অঞ্চলে কোনরূপ

দাঙ্গা হাঙ্গামার সূত্রপাত হইলে "রাণী মায়ের জয়" বলিয়া লাঠিয়ালেরা চীৎকার করিয়া থাকে।

ইতিমধ্যে রাণী টোনার খাল খনন করিয়া মধুমতী নদীর সহিত নবগঙ্গার যোগ করিয়া দেন। অর্দ্ধ মাইল ব্যাপী এই খালখননে ১ লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়াছিলেন। ইহাতে তাঁহার প্রজাগণের অশেষ উপকার সাধিত হইয়াছিল; কৃষিকার্য্যের উন্নতির সহিত প্রচুর শস্যোৎপাদনের সহায়তা করিয়াছিল। প্রজার ধনপ্রাণ মান রক্ষণে সহৃদয়া রাণী যে ভাবে প্রাণপণ চেষ্টা করিতেন, তাহা এখনকার তথাকথিত জমিদারগণের আদর্শ হওয়া উচিত। তিনি দানধ্যানে, ধর্ম্মকার্য্যে যেমন মনোনিবেশ করিয়াছিলেন, তেমনই জমিদারীর উন্নতি সাধন, প্রজার কষ্ট নিবারণ ও বিষয়াদি রক্ষণ-কল্পেও সুবন্দোবস্ত করিতেন। তিনি একদিকে যেমন বৈষয়িক তত্ত্বাবধান করিতেন, অপর দিকে তেমন দান-ধ্যানে ও ধর্ম্মকার্য্যে প্রচুর অর্থব্যয় করিতেন।

• এই সহৃদয়া তেজস্বিনী কীর্ত্তিমতী ঐশ্বর্য্যশালিনী বঙ্গমহিলার প্রকৃতি কিরূপ ছিল, তাঁহার জীবনের পূর্ব্ববিবৃত আখ্যানমালা হইতে পাঠক বুঝিয়া লইতে পারিবেন। ঐ আখ্যানমালায় দুই একটা স্তবক ধরিয়া তুলিয়া দেখিলে, যে গুণরাশির সৌরভ ফুটিয়া উঠে, তাহারই সুমিষ্টতম বিকাশ তাঁহার দক্ষিণেশ্বর নবরত্ন মন্দিরে—কালী বাড়ীতে। পরবর্ত্তী তৃতীয় খণ্ডে ইহার কিঞ্চিৎ পরিচয় দেওয়া যাইতেছে। দক্ষিণেশ্বর কালী বাড়ীর প্রতিষ্ঠায় আর্য্য-স্থাপত্য-বিদ্যার মহিমা রক্ষিত হইয়াছে। তখনকার শিল্পচাতুর্য্য প্রকৃষ্টরূপে প্রদর্শিত হইয়াছে, আর্য্যজাতির ঐশ্বর্য্যভোগের সার্থকতার আদর্শ পরিস্ফুট হইয়াছে। আর ভোগের সহিত ত্যাগের, সম্পদের সহিত নিস্পৃহতার, বিষয়ের সহিত সাধনার, লীলার সহিত শ্মশানের, ,ধাবল্লভের সহিত শিবশিবানীর সম্মিলন যে এখনও বাঙ্গালীর

দেশে সম্ভব, তাহা ঐ মন্দিরের পাদমূলে গঙ্গার তরঙ্গরাজি গাহিয়া গাহিয়া বহিয়া যাইতেছে। প্রকৃতই এমন সর্ব্বগুণসম্পন্না নারী যে এই সে দিন বঙ্গদেশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন; আমাদের বাঙ্গালী রমণীর হৃদয়ে যে এমন তেজ, এমন বুদ্ধি, এমন অধ্যবসায়, এমন সহৃদয়তা ফুটিতে পাইয়াছিল; ইহা ভাবিয়া কেবল কি তাঁহার বংশধরগণই গৌরবমণ্ডিত হইবেন—না সমস্ত বঙ্গবাসীও গৌরব বোধ করিবেন?



রাণী রাসমণি।

তৃতীয় খণ্ড।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

রাণীর কাশী-যাত্রার উদ্যোগ।

সন ১২৪২ সালে রাণীর বিশ্বেশ্বর দর্শনে মানস হয়। রাণী তদনুযায়ী হুকুম দেন, কাশী-যাত্রার উদ্যোগ করা হউক। তখন ভারতে বাষ্পীয় পোত বা ঊর্ণনাভ-তন্তুর ন্যায় রেল লাইন বিস্তৃত হয় নাই। যাত্রীরা একত্র দলবদ্ধ হইয়া ৫০।৬০ বা তদধিক লোক সমবেত না হইলে, কেহ তীর্থ-যাত্রায় সাহস করিত না। ৪।৫ খানি নৌকা এক সঙ্গে যাইত, কি স্থল-পথে, কি জল-পথে, প্রাণাপহারী দস্যু-তস্কর-ভীতি প্রবল ছিল। সে কারণ, রাণী যাতায়াতের জন্য যাহাতে কাহারও কষ্ট না হয়, সেই মত ৬ মাসের উপযোগী দ্রব্যাদি ২৫ খানি নৌকায় সজ্জিত করিলেন। বহু আত্মীয়, আত্মীয়া, কুটুম্ব, কুটুম্বিনী সমাগত হইল

নৌকার তালিকা

চাউলের জন্য	৪ খানি	কুটুম্ব কুটুম্বিনীদিগের জন্য	৪ খানি,
তৈল, লবণ, ইত্যাদি	৩ ,,	আমালাদের ,,	২ ,,
নিজের জন্য	১ ,,	ডাক্তার ও ঔষধ	১ ,,
জামাতাগণ	৩ ,,	রজক	১ ,,
দ্বারবান	২ ,,	৪টী গাভী	১ ,,
দাসীদের	২ ,,	বিচালী ,,	১ ,,

মোট ২৫ খানি বজরা প্রস্তুত হইল, যথাযথ দ্রব্য-সম্ভার স্তরে স্তরে তাহাতে বিন্যস্ত করা হইল। কয়েক জন দাস দাসী দ্বারবান প্রহরায় নিযুক্ত রহিল। স্থির হইল, আগামী কল্য প্রাতে যাত্রা করা যাইবে। রাণী যখন শোক-সন্তাপ-নাশিনী বিরাম-দায়িনী চেতনা-হারিণী নিদ্রার কোলে সুষুপ্তা, সেই সময়ে জগজ্জননী অন্নপূর্ণা দেবী স্বপ্নাবেশে তাঁহাকে আদেশ দিতেছেন, —"কল্যাণি, দেশে এখন তোমার সন্তানতুল্য প্রজারা অন্নকষ্টে পীড়িত, এ সময় কাশী যাওয়া মনন ত্যাগ কর; শিবশক্তির মূর্ত্তি এই থানে স্থাপন কর, আদেশ লঙ্ঘনে তোমার প্রিয়জনের অমঙ্গল হইবে।" নিদ্রা ভঙ্গ হইল। প্রভাতে রাণী হুকুম দিলেন, কাশী যাওয়া স্থগিত রহিল, দ্রব্য-সম্ভার বাটীতে না আনিয়া দানে বিতরণ করা হউক। নৌকা ছাড়িয়া দেওয়া হউক। হরিষে বিষাদ হইল, যাহারা কাশী যাইবার আনন্দে সারা রাত্রি যাপন করিয়াছিল, প্রভাতে তাহারা শুনিল, কাশী যাওয়া হইবে না। অনেকেই কারণ জানিবার জন্য উৎসুক হইল। রাণী কেবলমাত্র মথুর বাবুকে স্বপ্ন বৃত্তান্ত বলিয়াছিলেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

কালী বাড়ীর স্থান-নির্ব্বাচন ও মন্দির-নির্ম্মাণ।

রাণী রাসমণি স্বপ্নাদেশে বারাণসী যাত্রার সঙ্কল্প পরিত্যাগপূর্ব্বক "গঙ্গার পশ্চিম কূল বারাণসী সমতুল" এই ধারণার বশবর্ত্তিনী হইয়া কালী মন্দির স্থাপনের জন্য জামাতা মথুরামোহন বাবুকে গঙ্গার পশ্চিম তীরে স্থান অনুসন্ধান করিতে বলিলেন। কিন্তু বালী উত্তরপাড়া প্রভৃতি গ্রামে স্থান অন্বেষণ করিয়া বিফলমনোরথ হয়েন। তথাকার 'দশ আনি' 'ছয় আনি' খ্যাত প্রসিদ্ধ জমিদারেরা—রাণী প্রভূত অর্থ দানে স্বীকৃতা হইলেও—না কি বলিয়াছিলেন, তাঁহাদের অধিকৃত স্থানের কোথায়ও তাঁহারা অপরের ব্যয়ে নির্ম্মিত ঘাট দিয়া গঙ্গায় অবতরণ করিবেন না! রাণী বাধ্য হইয়াই পরিশেষে ভাগিরথার পূর্ব্বকূলে দক্ষিণেশ্বর নামক গ্রামে স্থান মনোনীত করিলেন।

যে স্থানটী মনোনীত হইল, উহার কিয়দংশ হেষ্টিংশ সাহেবের কুঠী ছিল এবং অপরাংশ মুসলমানদিগের কবর ডাঙ্গা ও গাজী সাহেবের পীরের স্থান ছিল। পঞ্চান্ন বিঘা ভূমি সার কুঠী পঞ্চান্ন হাজার টাকা মূল্যে খরিদ করা হয়। স্থানটীর আকার কূর্ম্মপৃষ্ঠের ন্যায় ছিল। ঐরূপ কূর্ম্মপৃষ্ঠাকৃতি শ্মশানই শক্তি প্রতিষ্ঠা ও সাধনার জন্য বিশেষ প্রশস্ত বলিয়া তন্ত্রশাস্ত্রে নির্দ্দিষ্ট আছে। ইহার দক্ষিণে গবর্ণমেণ্ট-মেগাজিন, উত্তরে যদুনাথ মল্লিকের বাগিচা, পূর্ব্বে বসতি ও পশ্চিমে গঙ্গা।

খরিদের সন ১২৪২ সাল হইতে মন্দিরের কার্য্য আরম্ভ হয়। প্রথমতঃ গঙ্গার ধারে পোস্তা ও ঘাট বান্ধিয়া উঠান হয়। বহু ক্লেশে এই কার্য্য প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে, এমন সময়ে পশ্চিম দক্ষিণ কোণস্থিত

ঘুঘুড়ির টেক হইতে সমাগত প্রবল বাণের আঘাতে তাহা ভাঙ্গিয়া চূর্ণবিচূর্ণ হইয়া যায়। ইহাতে রাণী রাসমণি অসন্তুষ্ট হইয়া মেকিণ্টশ কোম্পানীকে এক লক্ষ ষাইট হাজার টাকার চুক্তিতে পোস্তা ও ঘাট বান্ধিবার কণ্ট্রাক্ট প্রদান করেন। মেকিণ্টশ কোম্পানী ভাঙ্গা পোস্তা ও ঘাটের মূল পর্য্যন্ত উৎপাটিত করিয়া, অনেক নিম্ন হইতে বান্ধিয়া, অতীব দক্ষতা ও কৌশল সহকারে কার্য্য সমাপ্ত করেন। ইহাতে রাণী রাসমণি চুক্তির উপরেও কোম্পানীকে অনেক টাকা পারিতোষিক প্রদান করেন। সঙ্গে সঙ্গেই আদর্শ অনুসারে মন্দিরের কার্য্য আরম্ভ হইতে থাকে।

এই মন্দিরের বিশাল আঙ্গিনা দৈর্ঘ্যে ৪৪০ ফিট্, এবং প্রস্থে ২২০ ফিট্। এই আঙ্গিনা উত্তর দক্ষিণে গঙ্গাতটানুসারে বিস্তৃত। আঙ্গিনার পশ্চিম প্রান্তে উত্তর দক্ষিণে শ্রেণীবদ্ধ দ্বাদশ শিব মন্দির। মধ্যবর্ত্তী মন্দির দ্বয়ের একটু বাহিরে সিংহদ্বার ও নহবতখানা। তাহার লগ্ন পশ্চিমেই পাকা সড়ক, তাহার পশ্চিমেই পোস্তা হইতে বিশাল সোপান পংক্তি গঙ্গাগহ্বর পর্য্যন্ত বিস্তৃত—উহা মেকিণ্টশ কোম্পানী বান্ধিয়া ছিলেন। আঙ্গিনার উত্তর দক্ষিণ ও পূর্ব্ব প্রান্তে একতালা দালান-পংক্তিত্রয়; তাহাদের প্রত্যেকটীর মধ্য স্থল দিয়া বাহির হইবার জন্ত বড়, বড় তোরণ-দ্বার। আঙ্গিনার পূর্ব্ব প্রান্ত ব্যাপিয়া বিষ্ণুমন্দির, কালীমন্দির ও নাট মন্দির দক্ষিণাভিমুখে সংসক্তভাবে বিস্তৃত। মন্দির-দ্বয় ও নাট মন্দিরের পশ্চিমেই আঙ্গিনার বিশাল ভাগ; উহার পশ্চিম প্রান্তে দ্বাদশ শিবমন্দির।

মন্দিরের কার্য্য ১২৪২ সালে আরম্ভ হইয়া ১২৬০ সালে শেষ হয়। ইহাতে কিঞ্চিদধিক ছয় লক্ষ টাকা ব্যয়িত হইয়াছিল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

মন্দির-দৃশ্য।

দক্ষিণেশ্বর অতি মনোরম স্থান। ইহা একাধারে চতুর্ব্বর্গ ফল প্রদানে সমর্থ।

প্রথমতঃ—ইহা ভক্ত জনের সাধনার প্রধান স্থল; এমন শান্ত, নিস্তব্ধ, নিভৃত, ভক্তিমিশ্রিত স্থান আর বাঙ্গলায় আছে কি না সন্দেহ। এখানে প্রথম পরমহংস রামকৃষ্ণ দেব—যাঁহার সিদ্ধির আরম্ভও শেষ এই-স্থানেই হইয়াছে; দ্বিতীয়—তোতাপুরী যিনি রামকৃষ্ণ দেবের অন্যতম গুরুদেব, রামকৃষ্ণ সহবাসে গুরু হইয়াও অনেক দূর সাধন মার্গে অগ্রসর হইয়াছিলেন; তৃতীয়—ভৈরবী, যিনি কোথা হইতে অজানিত ভাবে আসিয়া রাম কৃষ্ণ দেবকে মাতৃবৎ স্নেহে পালন করিয়াছিলেন ও রামকৃষ্ণ দেবেব সিদ্ধির পথ প্রশস্ত করিয়া নিজে বহুদূর সিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন; চতুর্থ—রাণী, যাঁহার আগমন হইবে জানিতে পারিয়াই যেন বহু পূর্ব্বে তাঁহার পীঠস্থান স্বরূপে দক্ষিণেশ্বর নির্ম্মাণ করাইয়া তাঁহার আসায় আশায় উদ্‌গ্রীব হইয়াছিলেন এবং তাঁহার আগমনের পর মুক্তির পথে পথিক হইয়াই নশ্বর ধরায় অতুলনীয় কীর্ত্তি রাখিয়া মহাপ্রস্থান করিলেন; পঞ্চম—রাণীর জামাতা মথুর বাবু, রাণী গত হইবার পর যাঁহাকে রামকৃষ্ণ রসদ্দার বলিতেন, রাম ও কৃষ্ণ এক সঙ্গে দুই ভাবে পাইয়া বহু উন্নত হইয়াছিলেন; এই সকল মহাত্মার লীলা ক্ষেত্র।

দ্বিতীয়তঃ—ইহা স্বাস্থ্যপ্রদ, নির্ম্মল বায়ু জাহ্নবী-শীকর-সম্পৃক্ত হইয়া সন্ধ্যায়, প্রভাতে, দ্বিপ্রহরে রুগ্নদেহে নবজীবন দানে সমর্থ। পুণ্যতোয়া ভাগীরথী অহোরাত্র ছল ছল কল কল ভাষায় অনন্ত দেবের অনন্ত মহিমা অনন্তকাল গাহিয়া গাহিয়া সাগরোদ্দেশে ছুটিয়াছে। তীর নানাবিধ পুষ্প সম্ভারের স্তর সন্নিবেশ। প্রকৃতই ইহা স্বাস্থপ্রদ।

তৃতীয়তঃ—ইহার দেব-মন্দির, নাট্য-মন্দির, নবরত্ন চূড়াবিশিষ্ট কালীর মন্দির, রাধা গোবিন্দ জীউর মন্দির ইত্যাদিতে যে কলা বিদ্যা, শিল্প বিদ্যার পরিচয় আছে, তাহা পুরুষোত্তমের জগদীশের মন্দির ও ভুবনেশ্বর মন্দির ব্যতীত বঙ্গের কোন মন্দিরে বা রাজ প্রাসাদেও নাই। নির্ণিমেষ নয়নে দেখিলে বুঝিতে পারা যাইবে যে, কলা বিদ্যার প্রকৃষ্ট পরিচয় উহাতে আছে।

চতুর্থতঃ।—বিলাসিতার চরম স্থল। বিলাসীর পক্ষে এমন নিভৃত মলয়মারুত-সেবিত কন্দ-কবরী, গোলাপ-গন্ধরাজ, চম্পক-চামেলী, জবা-জাতি, বেলা-বকুল, মল্লিকা-মালতী, যুথিকা-রজনী-গন্ধা বাসিত, আমোদে দিক আমোদিত, স্থান আর নাই। এই কারণেই ইহা চতুর্ব্বর্গ দানে সমর্থ। অধম লেখকের সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ, যিনি এই মনোরম স্থান দর্শনে বঞ্চিত আছেন, একবার অবসর মত দেখিয়া আসিবেন।

জাহ্নবী-বক্ষে যাঁহারা বাষ্পীয় পোতে বা তরণী যোগে যাতায়াত করিয়াছেন, তাঁহারা দক্ষিণেশ্বর ঠাকুর বাটী দেখিয়াছেন। প্রথম দৃষ্টি-পাতেই দূর হইতে দ্বাদশ শিবমন্দির ও নবরত্ন চূড়া দৃষ্টি গোচর হয়। নিকটে যাইলে দেখা যাইবে কেমন কৌশলে, বহু মুদ্রা ব্যয়ে, জাহ্নবীর অপ্রতিহত বেগ রোধ করিবার জন্য কোথাও সরল, কোথাও বক্র, কোথাও ঢালু-ভাবে রাণী পাকা পোস্তা বাঁধাইয়াছেন। ভিতরে রাধাশ্যামের যুগল

মূর্ত্তি ও আদ্যাশক্তি কালী মূর্ত্তি পৃথক্ পৃথক্ মন্দিরে অবস্থিত। রৌপ্য সিংহাসনে রাধাশ্যাম বিরাজ করিতেছেন; দেহে নানাবিধ, যেথানে যা সাজ, স্বর্ণালঙ্কারে ভূষিত। আদ্যাশক্তির মূর্ত্তি একাদশ বর্ষীয়া বালিকার মত, শবরূপা শিবের উপর স্থাপিত। রৌপ্য নির্ম্মিত বহুদ্রব্য চারিপাশে বিন্যস্ত। সম্মুখে নাট্য মন্দির। ত্রিমন্দিরেই কলাবিদ্যার পরিচয় আছে। নাট্য মন্দিরে দাশুরায়, গোবিন্দ অধিকারী, কবির দল, নানাবিধ যাত্রাদি ও আমোদ প্রমোদের স্থান ছিল।

প্রাঙ্গণ বহু বিস্তৃত—এককালীন সহস্র লোকের সমাবেশ, উপবেশন, ভোজন হইতে পারে। তিন পার্শ্বেই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গৃহ; কোনটী দেওয়ান খানা, কোনটী আলোক প্রস্তুতের স্থান, কোনটী ভোগরাগের স্থান, কোনটী রন্ধন শালা, কোনটী শয়নাগার। পূর্ব্ব, দক্ষিণ ও পশ্চিম তিন দিকেই ঘর। পশ্চিমে ঘাট ও চাঁদনী উহার সহিত সোপান শ্রেণী আসিয়া গঙ্গায় মিলিত হইয়াছে। দুই পার্শ্বেই পুষ্পকানন। দক্ষিণ দিকে একটি দ্বার, পার্শ্বে আম্র-কানন ও নহবৎখানা। পূর্ব্বে একটি দ্বার, পুষ্করিণী ও আম্রকানন। উত্তরে একটি দ্বার ও দ্বোবারিকদিগের বিশ্রাম ও প্রহরার স্থান। সম্মুখেই প্রমোদ-ভবন বা চলিত কথায় "বাবুকুঠী" বাবুকুঠীর পশ্চাতেই পুষ্করিণী। দূরে পশ্চিম কোণে রামকৃষ্ণদেবের গৃহ। একদিকে ~~নারিকেল~~, বেল, নারিকেল কুল, দেশীকুল, প্রভৃতি ও হৈমন্তিক রবি শস্য উৎপন্ন করিবার স্থান; পার্শ্বেই আম্রকানন, উত্তমোত্তম দেবভোগ্য, রসনার তৃপ্তিকর রসাল বৃক্ষ। প্রমোদ ভবনের পার্শ্বেই সোপনশ্রেণী গঙ্গার সহিত মিশিয়াছে, পার্শ্বেই নহবৎখানা। কিছু দূরে পঞ্চবটী—ইহা অতীব পবিত্র শান্তিপ্রদ নির্জ্জন স্থান। উত্তর-পূর্ব্ব কোণে একটী ক্ষুদ্রায়তন, অপেক্ষাকৃত স্বল্প বারিযুক্ত, পুষ্করিণী। পার্শ্বেই শৌচাগার। প্রমোদ-ভবনের অনতিদূরে গোশালা, অশ্বশালা, যান রক্ষার ও শকটচালকগণ ও তাহাদের

সহচরদিগের বসিবার স্থান এবং উদ্যান-রক্ষক ও তাহার উদ্যান সম্বন্ধীয় যন্ত্রাদি রক্ষার স্থান, তৎপার্শ্বে হস্তী থাকিবার স্থান।

গঙ্গার পশ্চিম তীর হইতে পূর্ব্বতটবর্ত্তী দক্ষিণেশ্বর মন্দিরের প্রতি দৃষ্টি করিলে দ্বাদশ শিব-মন্দিরসহ সমস্তগুলি একটী মন্দির বলিয়া প্রতীতি হয়। সে দিব্য দৃশ্য দর্শন করিলে মনে হয়, যেন দেবরাজ শতক্রতু শতযূপ-চিহ্নিত, শতচূড়া-নির্ম্মিত, শত পতাকা-সমাকুল স্বকীয় বিমান, রাণী রাসমণির মন্দির ছলে ভাগীরথী তটে রাখিয়া অবগাহনার্থে গাঙ্গবারিতে নিমগ্ন হইয়াছেন। বস্তুতঃ দক্ষিণেশ্বরের মন্দির গৌড়দেশীয় ধর্ম্মানুরাগের বিজয়-পতাকা।



চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

প্রতিষ্ঠা ও দান।

দেবদেবীমূর্ত্তি নির্ম্মাণারম্ভের দিবস হইতে রাণী যথাশাস্ত্র কঠোর তপস্যার অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। ত্রিসন্ধ্যা স্নান, হবিষ্যান্ন ভোজন, মাটিতে শয়ন ও যথাশক্তি জপপূজাদি করিয়াছিলেন; পরে মন্দির ও মূর্ত্তি নির্ম্মিত হইলে প্রতিষ্ঠার জন্য ধীরে-সুস্থে বিশেষ প্রশস্ত দিবসের নির্দ্ধারণ হইতেছিল এবং মূর্ত্তিটী ভগ্ন হইবার আশঙ্কায় বাক্সে বন্ধ করিয়া রাখা হইয়াছিল। এমন সময়ে যে কোন কারণেই হউক দেবীমূর্ত্তি ঘামিয়া উঠে এবং রাণীকে স্বপ্নে প্রত্যাদেশ দেন—"আমাকে আর কত দিন এইভাবে আবদ্ধ করিয়া রাখিবি? আমার যে এরূপে থাকিতে কষ্ট হইতেছে; যত শীঘ্র পারিস্ আমাকে সুপ্রতিষ্ঠা কর!" ঐরূপ প্রত্যাদেশ লাভ করিয়াই রাণী দেবী-প্রতিষ্ঠার জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়েন এবং স্নানযাত্রার পূর্ণিমার অগ্রে অন্য কোন প্রশস্ত দিন না পাইয়া, ঐ দিনেই ঐ কার্য্য সম্পন্ন করিতে সঙ্কল্প স্থির করেন। ১২৬১ সালের ১৮ই জ্যৈষ্ঠ তারিখে স্নানযাত্রার দিন মহাসমারোহে দুই লক্ষাধিক মুদ্রা ব্যয়ে দক্ষিণেশ্বরের দেবালয় প্রতিষ্ঠা কার্য্য সম্পন্ন হয়।

সেই স্নানযাত্রার দিন প্রভাত না হইতেই দক্ষিণেশ্বর পল্লী উৎসবের উল্লাসে জাগরিত হইয়া উঠিল। দিনদেব গগনাঙ্গণে উদিত হইয়া দেখিলেন, দেবালয়ের বিশালপ্রাঙ্গণ বিপুলজনতায় পরিপূর্ণ, তথাপি জনস্রোত মন্দিরা-

ভিমুখে ধাবিত হইতেছে। দেখিতে দেখিতে শঙ্খ ঘণ্টারবে দিক্‌চয় মুখরিত হইল। কোথাও উচ্চকণ্ঠে হরি-সংকীর্ত্তনে, কোথাও গগনভেদী বোম্ বোম্ রবে, কোথাও জগন্মাতার গম্ভীর জয় গানে, ভক্তির পূর্ণোচ্ছ্বাসে ভাগীরথী টল্ টল্ করিতে লাগিলেন।

বহুদেশ বিদেশ হইতে বহু ব্রাহ্মণ নিমন্ত্রিত, অনিমন্ত্রিত, অনাহুত, অভ্যাগত আসিয়াছিলেন, বহু আত্মীয় কুটুম্ব বহু দিন হইতে আসিয়াছিলেন। হুগলী কুলিহাণ্ডা হইতে লেখকের খুল্ল-পিতামহ, পিতামহী ও সাঁতরা বংশের অনেকেই উপস্থিত ছিলেন। তালুক হইতে ও জমিদারি হইতে বহু দ্রব্য আনিত হইয়াছিল। নায়েব গোমস্তা অনেকেই আসিয়া এক একটি কার্য্যের ভার লইয়াছিলেন। শালবাড়িয়া তালুক হইতে ২টী হস্তী আসিয়াছিল, ঐ হস্তী পৃষ্ঠে অতি উত্তম বিশুদ্ধ ঘৃত আনিত হইয়াছিল।

ব্রাহ্মণগণ একত্রিত হইলে স্থির হইল—কে হোম কার্য্য ব্রতী হইবে, কে তন্ত্রপাঠক হইবে, কে উত্তর সাধক হইবে, কোন্ জন কোন্ কার্য্যের ভার লইবে। এই সমস্যা লইয়া মহা গোলমাল হইতে লাগিল গৌড়াদ্য-দ্রাবিড়-বৈদিক ব্রাহ্মণগণ একবাক্যে বলিলেন যে, আমরা মন্ত্রপাঠ করিব ও হোমকার্য্য সমাধা করিব। অন্য শ্রেণির ব্রাহ্মণ গণ বলিলেন আমরা এই কার্য্য সম্পাদন করিব। এইরূপে মহা কোলাহল লাগিয়া গেল। মথুর বাবু তখন সকলকে স্থির-চিত্তে কর্ত্তব্য নির্ণয় করিতে বলিলেন। সভা আহুত হইয়া মীমাংসা হইল, অন্যশ্রেণীর শ্রোত্রিয়গণ হোতৃ হইবেন। গৌড়াদ্য-বৈদিক ব্রাহ্মণগণ মন্ত্র পাঠ করিবেন। পরমহংস রামকৃষ্ণ দেবের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রামকুমার ভট্টাচার্য্য হোম করেন। যাহা হউক বিবাদ মিটিয়া যায় এবং হোম কার্য্য ও প্রতিষ্ঠাকার্য্য নির্ব্বিঘ্নে সমাধা হয়। নিম্নলিখিত গৌড়াদ্য বৈদিক ব্রাহ্মণগণ সে ক্ষেত্রে উপস্থিত ছিলেন।—

১।	লম্বোদর সার্ব্বভৌম	সাকিম	পূর্ব্বহিজিলা।
২।	রাঘব তর্কসিদ্ধান্ত	,,	ডেঙ্গরগাছা।
৩।	গৌরচন্দ্র বিদ্যালঙ্কার	,,	স্থলতানপুর।
৪।	বদন বাচস্পতি	,,	দেবীপুর।
৫।	দ্বিজবর বিদ্যারত্ন	,,	ঐ
৬।	ভাগবৎ বিদ্যালঙ্কার	,,	তেঘরি।
৭।	গুরুচরণ শিরোমণি	,,	বাসুদেবপুর।
৮।	ভুবনেশ্বর বিদ্যালঙ্কার	,,	ঐ
৯।	ভোলানাথ সার্ব্বভৌম	,,	বলরামবাটী।
১০।	তপস্বীরাম বিদ্যাবাগীশ	,,	ঐ
১১।	ঈশ্বরচন্দ্র চূড়ামণি	,,	ঐ
১২।	ঠাকুরদাস বিদ্যালঙ্কার	,,	শ্রীরামপুর।
১৩।	রামচন্দ্র চূড়ামণি	,,	বাসুবাটী।
১৪।	মনসাচরণ বিদ্যালঙ্কার	,,	ঐ
১৫।	মুক্তারাম বাচস্পতি	,,	মাদড়া।
১৬।	ক্ষেত্রনাথ তর্কবাগীশ	,,	ব্রাহ্মণপাড়া।
১৭।	রামসুন্দর চক্রবর্ত্তী (রাণীর গুরুদেব)	,,	বাগবাজার।
১৮।	উমাচরণ ভট্টাচার্য্য (ঐ পুরোহিত)	,,	বরাহনগর।
১৯।	বিশ্বনাথ তর্কপঞ্চানন	,,	গোগুলপাড়া।
২০।	ঈশানচন্দ্র ন্যায়বাগীশ	,,	গোগুলপাড়া।
২১।	রামকুমার তর্কালঙ্কার	,,	জগদ্বল্লভপুর।
২২।	পীতাম্বর চূড়ামণি	,,	ঐ
২৩।	পঞ্চানন বিদ্যালঙ্কার	,,	কাঁশরা।
২৪।	দিননাথ ঐ	,,	পাঁচারুল।

২৫।	মধুসূদন তর্কালঙ্কার	স্যাকিম	গুস্‌করা।
২৬।	ঐ চূড়ামণি	,,	বেলকুলী।
২৭।	গোপাল শিরোমণি	,,	খলসিনী।
২৮।	ক্ষেত্রনাথ বিদ্যালঙ্কার	,,	ঝিখিরা।
২৯।	গোলকচন্দ্র ঐ	,,	জগৎনগর।
৩০।	কার্ত্তিকচন্দ্র ন্যায়রত্ন	,,	অনন্তরামপুর।
৩১।	মাধব শিরোমণি	,,	হাকিমপুর।
৩২।	মদনমোহন তর্কালঙ্কার	,,	মেলে।
৩৩।	ঈশানচন্দ্র বিদ্যার্ণব	,,	কাঁকড়াফুলি।
৩৪।	গণেশচন্দ্র সিদ্ধান্তবাগীশ	,,	গোপালনগর।
৩৫।	মধুসূদন চূড়ামণি.	,,	পাঁচারুল।
৩৬।	নৃসিংহ বিদ্যারত্ন	,,	কাঁশরা।
৩৭।	রণরাম ভট্টাচার্য্য	,,	ধামাই টিকর।
৩৮।	ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য্য	,,	দেওয়ানের ভেড়ী।
৩৯।	নবকুমার চূড়ামণি	,,	বাসুদেবপুর।
৪০।	পরাণচন্দ্র বিদ্যারত্ন	,,	মধুবাটী।
৪১।	বিশ্বম্ভর ভট্টাচার্য্য	,,	বাঁকীপুর।
৪২।	গঙ্গাধর ঐ	,,	মির্জ্জাপুর।
৪৩।	মনোমোহন ঐ	,,	ঐ
৪৪।	সারদা বিদ্যাবাগীশ	,,	মেলে।
৪৫।	রামচন্দ্র চূড়ামণি	,,	চাণক মণিরামপুর।
৪৬।	ফকিরদাস ভট্টাচার্য্য	,,	ভাহুড়া।
৪৭।	রামমোহন তর্কালঙ্কার	,,	নাটাগড় দিকড়া।
৪৮।	সীতারাম বিদ্যাভূষণ	,,	পাঁতিহাল।

৪৯।	সীতারাম ভট্টাচার্য্য	সাকিম	সেয়াগড়।
৫০।	চণ্ডীচরণ বিদ্যাভূষণ	,,	পাইকপাড়া।
৫১।	সার্থকরাম শিরোমণি	,,	নয়াচক।
৫২।	বৈকুণ্ঠনাথ ন্যায়রত্ন	,,	সাচক।
৫৩।	কৃত্তিবাস ভট্টাচার্য্য	,,	পানপুর।
৫৪।	বৈকুণ্ঠ ন্যায়রত্ন	,,	গোগুলপাড়া।
৫৫।	পীতাম্বর চূড়ামণি	,,	জগদ্বল্লভপুর।
৫৬।	রামকল্প ভট্টাচার্য্য	,,	কেশব নগর।
৫৭।	কালীপদ বিদ্যার্ণব	,,	ওয়াদপুর।
৫৮।	লালচাঁদ বিদ্যানিধি	,,	ঐ
৫৯।	কাশীশ্বর বিদ্যারত্ন	,,	হরাল।
৬০।	মুক্তারাম ভট্টাচার্য্য	,,	আদান।
৬১।	উমাচরণ ঐ	,,	ঐ
৬২।	মহেশচন্দ্র চূড়ামণি	,,	খাষ্টহানা।
৬৩।	কেশবচন্দ্র তর্কবাগীশ	,,	গড় ভবানীপুর।
৬৪।	বৈকুণ্ঠনাথ ন্যায়রত্ন	,,	বালীচক।
৬৫।	গোবিন্দচন্দ্র বিদ্যাভূষণ	,,	ইটারাই।
৬৬।	বৈকুণ্ঠনাথ ন্যায়রত্ন	,,	কলিকাতা বেলগেছিয়া।
৬৭।	কৃত্তিবাস তর্করত্ন	,,	গোগুলপাড়া।
৬৮।	রাইচরণ ভট্টাচার্য্য	,,	ঐ
৬৯।	বৃন্দাবন ভট্টাচার্য্য	,,	কমলাপুর।
৭০।	পার্ব্বতীচরণ ভট্টাচার্য্য	,,	মামুদপুর।
৭১।	যদুনাথ সার্ব্বভৌম	,,	জগদ্বল্লভপুর।
৭২।	মাধবচন্দ্র তর্কালঙ্কার	,,	মাদড়া।

৭৩।	কালীচরণ চূড়ামণি	সাকিম	ভগবতীপুর।
৭৪।	কাশীনাথ ভাগবতভূষণ	,,	শশাবেড়িয়া।
৭৫।	শ্যামচরণ তত্ত্বনিধি	,,	উগারদহ।
৭৬।	প্রেমচাঁদ বাচস্পতি	,,	গোগুলপাড়া।
৭৭।	বাণেশ্বর বিদ্যাভূষণ	,,	ওয়াদিপুর।
৭৮।	চিন্তামণি বিদ্যাসাগর	,,	ঐ
৭৯।	বনমালী চূড়ামণি	,,	ঐ
৮০।	নবকুমার শিরোমণি	,,	ঐ
৮১।	প্রতাপচন্দ্র হালদার	,,	তেঘরি।
৮২।	দেবীচরণ তর্কালঙ্কার	,,	পোলবা গুঁয়াই।
৮৩।	রামধন ভট্টাচার্য্য	,,	বাজেপ্রতাপ।
৮৪।	আনন্দগোপাল চূড়ামণি	,,	খোষালপুর।
৮৫।	শ্রীভুবনমোহন ভট্টাচার্য্য	,,	রঘুনাথপুর।
৮৬।	শ্রীব্রজনাথ চক্রবর্ত্তী	,,	ওয়াদিপুর।

এতদ্ব্যতীত নবদ্বীপ, কাশী, ভট্টপল্লী, পুরী, বিক্রমপুর, পুনা, মান্দ্রাজ প্রভৃতি ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশ হইতে সমাগত বহুসংখ্যক ব্রাহ্মণগণ উপস্থিত ছিলেন। সকলেই যথাযোগ্য দক্ষিণা ও দান গ্রহণে পরিতুষ্ট হইলেন। অন্নপূর্ণা স্বরূপিনী রাণী দীন-দরিদ্রগণকে অকাতরে অন্ন বিতরণ করিলেন। বিপুল জনসংঙ্ঘ সে দিন পানভোজনে পরিতৃপ্ত হইয়াছিল। দধি-পুষ্করিণী, পায়স-সমুদ্র, ক্ষীর-হ্রদ, দুগ্ধ-সাগর, তৈল-সরোবর ঘৃত-কূপ, লুচী-পাহাড় মিষ্টান্ন-স্তূপ, কদলী-পত্র-রাশি, মৃণ্ময়পাত্রের স্তূপ প্রভৃতির অপূর্ব্ব দৃশ্যে পুণ্যশীলা রাণীর সেই অন্নদান-যজ্ঞ পরম শোভাসম্পন্ন হইয়াছিল। অসাধারণ প্রতিভা সম্পন্ন তেজোময়ী এই আর্য্যনারী যে প্রণালীতে সেই বৃহদনুষ্ঠান নির্ব্বাহ করিয়া গিয়া-

ছেন, অধুনা বাঙ্গলার তেমন বুদ্ধিমান শিক্ষিত ব্যক্তিও সে সকল কার্য্য ও সৌষ্ঠব সহসা ধারণা করিতে সমর্থ হইবেন না। তাঁহার এই দান কার্য্যের তুলনা নাই। তাঁহার এই পুণ্য কার্য্যের বিষয় চিন্তা করিলে শরীর রোমাঞ্চিত হয়। বঙ্গীয় মহিলা এই সে দিন গৌড়ীয় ধর্ম্মানুরাগের বিজয়স্তম্ভ স্বরূপ—বাঙ্গালার স্থাপত্য বিদ্যার—কলা বিদ্যার শেষ নিদর্শন যে কীর্ত্তি স্থাপন করিয়া গিয়াছেন, যে দানযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছেন, পুণ্যসলিলা ভাগীরথী তরঙ্গ-কল্লোলে অনন্তকাল তাহার জয়গীতি গাহিয়া গাহিয়া বহিয়া যাইবে।

দানেই তাঁহার বীরত্ব। তাঁহার হৃদয়ের অনুপম গুণরাশির সুমিষ্টতম বিকাশ এই দক্ষিণেশ্বর কালীমন্দিরে। এই তাঁহার প্রধান কীর্ত্তি। এখানেই তাঁহার মহত্ত্বের প্রতিষ্ঠা। এখান হইতেই তাঁহার সুকৃতির সৌরভে দিগ্‌-দিগন্ত আমোদিত হইয়াছিল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

"ভবতারিণী মূর্ত্তি" ও সেবা পূজাদির ব্যবস্থা।

কালী-মন্দিরের অভ্যন্তরে বেদীর উপরে ঘনরৌপ্যনির্ম্মিত যথাক্রমে ছোট বড় দলে গঠিত রৌপ্য-শতদল ; উহার পরিধি প্রায় তিন হাত। এই বিশাল ঘন দৃঢ় রৌপ্যময় দল গঠিত শতদলের উপরে শিব! তাঁহার উপরে স্থিতা আট নয় বর্ষ বয়স্কা একটী পাষাণময়ী বালিকা-মূর্ত্তিই দক্ষিণেশ্বরের প্রসিদ্ধ ৺কালী। সে মূর্ত্তি অতীব আনন্দময়ী, দেখিলেই বাৎসল্য-ভক্তির সঞ্চার হয়। রাণী রাসমণি যেমন অপার ঐশ্বর্য্যশালিনী রাণী, এ কন্যাও তেমনই সর্ব্বাভরণ-ভূষিতা রাজকন্যা। শিরঃ, কর্ণ, কণ্ঠ, বক্ষঃ, কটি, পাদপদ্ম কাঞ্চন-রত্নাদিতে পরিব্যাপ্ত ও খচিত। পার্শ্বেই রৌপ্যময় খাট ও শয়নের বিবিধ সমুজ্জ্বল উপকরণ ; রূপার বাটা, রূপার কলস, হাঁড়ী, স্থালী, গ্লাস চামর প্রভৃতি যথানিয়মে সজ্জিত। দেখিলেই মনে হয়, যেন রাজাভরণে গর্ব্বিতা আনন্দময়ী দিব্য বালিকা। ইহাঁর পূজার জন্যই রাণী রাসমণি অপার ধন জলস্রোতের ন্যায় দক্ষিণেশ্বরে ঢালিয়া দিয়াছেন। সে অর্থের দ্বারা একজন লোক মহারাজ উপাধি গ্রহণ, ধারণ ও পোষণ করিতে অবলীলাক্রমে সমর্থ হয়।

কালীবাড়ীর সেবা নির্ব্বাহের জন্য রাণী রাসমণি যে জমদারী দেবোত্তর দান * করিয়াছেন তাহা দিনাজপুর জেলার ৭৩।৭৪ নং

---

*অনেকে বলেন প্রতিষ্ঠার সময় দক্ষিণেশ্বর দেবালয় গুরুকুলকে দান করিয়াছিলেন

তৌজীভুক্ত। উহার সদর জমা বার্ষিক চব্বিশ হাজার টাকা বার্ষিক স্থিত প্রায় যাইট হাজার টাকা। এই জমিদারীর মূল্য চিন্তা করিলে বিস্মিত হইতে হইবে। রাণী রাসমণির জীবন কালে এই জমিদারীর আয়ে কালীবাড়ীর বিরাট দেবসেবা ও অতিথি সেবার সামান্য অংশই নির্ব্বাহ হইত! এখনও এই জমিদারীর আয় দ্বারা কালীবাড়ীর পূজা, উৎসব ও আতিথ্যব্যয় সঙ্কুলান হয় না, আরও টাকা দিতে হয়। রাণীর জীবনকালের মহোৎসবে, অন্নদান যজ্ঞে প্রতি বৎসর বহুতর টাকা অন্য তহবিল হইতে প্রদান করিতে হইত। তাঁহার সময়ে মন্দিরের সন্নিহিত স্থানের মাসিক ৫০৲ টাকার ন্যূন বেতন-ভোগী যে কোন আফিসের কর্ম্মচারী ইচ্ছা করিলে প্রতিদিন কালীর অন্ন-ভোগ প্রসাদ পাইতেন—বাসা খরচ করিতে হইত না। ইহা একটা নিয়ম মাত্র—মূলে নিকটস্থ বাসাধারী প্রায় সকলেই কালীর প্রসাদ পাইতেন। এইরূপ বিরাট ব্যয় পশ্চিমের রাজ রাজারা ছাড়া অন্যের পক্ষে নির্ব্বাহ করা কত কঠিন, তাহা চিন্তনীয়! স্বর্গীয়া রাণী রাসমণি অম্লানচিত্তে, খোলা হৃদয়ে এই ব্যয়ভার অকাতরে বহন করিয়াছেন। মন্দিরের ভূমি ক্রয়, পোস্তা, ঘাট, মন্দির নির্ম্মাণ, মন্দির প্রতিষ্ঠা, দেবোত্তর জমিদারী দান, সেবা, উৎসব ও আতিথ্যের বাবদ এক দক্ষিণেশ্বরের কল্যাণেই রাণী রাসমণি

কিন্তু মন্দিরসংক্রান্ত দলিলপত্রে দেখা যায় যে, ১২৬৮ সালে অথবা ১৮৬১ খ্রীঃ ২৭শে আগষ্ট তারিখে রাণী দিনাজপুর বিভাগের জমিদারীসহ উক্ত দেবালয় দেবোত্তর সম্পত্তিরূপে রেজেষ্ট্রী করিয়া দিয়াছিলেন। মন্দিরের কার্য্য ১২৪২ সালে আরম্ভ হইয়া অষ্টাদশবর্ষ কাল পরে ১২৬০ সালে শেষ হয় এবং ১২৬১ সালে স্নান যাত্রার দিন মন্দির প্রতিষ্ঠা হয়; তৎপরে উহা লেখা পড়া করিয়া রেজেষ্ট্রী করিয়া দেওয়া হইয়াছে।

প্রায় চল্লিশ লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়া গিয়াছেন !! ইহা ছাড়া দেবতা-প্রতিষ্ঠা ও অন্যান্য বিবিধ তীর্থে অন্নসত্রাদির কথা ত বলাই বাহুল্য। রাণী রাসমণি এই অপার অর্থ ব্যয় করিয়াও স্বকীয় জমিদারী প্রভৃতি সম্পত্তির বিন্দুমাত্র ক্ষতি করিয়া যান নাই। সেগুলি তাঁহার বংশধরগণের হস্তে ক্রমশঃই বিস্তার লাভ করিতেছে। দক্ষিণেশ্বরের কালী মাতার সেবার্থে রাণী রাসমণি ৭০।৭৫ জন কর্ম্মচারী এবং একটী ব্রাহ্মণ-পরিবারও নিযুক্ত করিয়াছিলেন। এই ব্রাহ্মণ পরিবারের নিবাস জেলা হুগলীর অন্তর্গত কামারপুকুর গ্রাম। ইহাঁরা রাঢ়ীয় কুলীন ব্রাহ্মণ, খড়দহ মেল, গোপালের সন্তান, স্বভাব ; ইহাঁরা চট্টোপাধ্যায়।

৺কালী মাতার পূজা নির্ব্বাহের জন্য রাণী রাসমণি খুদীরাম চট্টোপাধ্যায়ের জ্যেষ্ঠপুত্র রামকুমার চট্টোপাধ্যায়কে নিযুক্ত করেন। তাঁহার পুত্রপৌত্রগণ ৺কালীমাতার পূজারীগিরি করিয়া আসিতেছেন। খুদিরাম চট্টোপাধ্যায়ের তিন পুত্র। জ্যেষ্ঠ রামকুমার, মধ্যম রামেশ্বর, কনিষ্ঠ গদাধর। ৺রামেশ্বরের পুত্র রামলাল।

এই দক্ষিণেশ্বরের কালীবাড়ীর পূজারীর কার্য্য অতীব শ্রমসাধ্য ব্যাপার। দৈনন্দিন কার্য্য মধ্যে প্রতিদিন প্রাতে আরতি করিতে হয়, দশটার সময় নৈবেদ্যভোগ, বারটার সময় অন্নব্যঞ্জন ভোগ, ছয়টার সময় ছানাসন্দেশাদি দ্বারা বৈকালিক ভোগ, রাত্রি আটটার সময় শীতলীভোগ লাগাইতে হয়। ইহা ছাড়া প্রতি অমাবস্যায় পূজা, বিশেষতঃ কার্ত্তিক অমাবস্যা, সাবিত্রী চতুর্দ্দশী, স্নানযাত্রা ও জন্মতিথির পূজা বিশেষ কার্য্য। ইহা ছাড়া দুর্গোৎসব, বাসন্তী, রটন্তী, জগদ্ধাত্রী পূজা করিতে হয় ; প্রয়োজন মতে বিষ্ণু অর্চ্চনার উৎসব, ঝুলন, জন্মাষ্টমী, রাস প্রভৃতিতে যোগ দিতে হয়।

রামকুমার ভট্টাচার্য্য দক্ষিণেশ্বর মন্দির প্রতিষ্ঠার পর ৺কালীমাতার পূজকপদে প্রথম নিযুক্ত হইয়াছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পর, তদীয় কনিষ্ঠ

ভ্রাতা গদাধর রাণীর জামতা মথুর বাবুর কৃপায় পূজারীর কার্য্যে ব্রতী হন এই গদাধরই ভবিষ্যৎ 'রামকৃষ্ণ পরমহংস'।

এই গঙ্গাতীরবর্ত্তী দেবালয়—এই পুণ্যভূমিই তাঁহার ভাবী সাধনা-ক্ষেত্র, জীবনের লীলাস্থল। বঙ্গের এই মহাপীঠ হইতেই তিনি ভাবীজীবনে "সব ধর্ম্ম সত্য, যত মত তত পথ" এই উদারনীতি প্রচার করিয়াছিলেন; মনের সাধে মায়ের পূজা করিতে পারিয়াছিলেন।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

রামকৃষ্ণ পরমহংস।

পরমহংস রামকৃষ্ণের কতিপয় শিষ্য তাঁহার বাহ্য ও অন্তর্জীবন সম্বন্ধে অনেক কথা লিখিয়াছেন। তাঁহারা পরমহংসের ভজন ও উপদেশাদি সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, তাহার উপরেই অনেকাংশে আমাদিগকে নির্ভর করিতে হইবে; কিন্তু তাঁহার বাহ্য জীবনের অবস্থায় যাহা দক্ষিণেশ্বর ও দক্ষিণেশ্বর নবরত্নমন্দিরের স্থাপয়িত্রীসহ বিজড়িত, যাহা স্বাধীন প্রমাণান্তরবেদ্য সেই অংশে তাঁহাদের বর্ণনার উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিতে পারি না; এই অংশে তাঁহাদের লেখা অপূর্ণ, অস্পষ্ট, মলিন ও সহৃদয়তা-বিহীন। অথচ, এই অংশের মধ্যেই পরমহংস রামকৃষ্ণের ধর্ম্মজীবনগত জন্ম, শৈশব, যৌবন, বার্দ্ধক্য ও অবসান নিহিত রহিয়াছে। মন্বাদি শাস্ত্রে দেখিতে পাই, প্রাকৃত জনক জননী হইতেও ধর্ম্মজীবনের পালকপালিকাগণের ঋণ অধিকতর গুরুভারাক্রান্ত। ধর্ম্মজীবনের সহায় ও আশ্রয়দাতৃগণের জীবনসহ ধার্ম্মিকের জীবন অচ্ছেদ্য শৃঙ্খলে শৃঙ্খলিত থাকে। সেই শৃঙ্খল-সৌন্দর্য্য ও মহিমা হৃদয়ঙ্গম না হইলে, ধার্ম্মিক জীবন বুঝিয়া উঠা যায় না। এমন কি, ধর্ম্মজীবনের শত্রুগণ পর্য্যন্তও আলোকপ্রদ হয় এবং ধার্ম্মিকের সঙ্গে সঙ্গে অমরতা লাভ করিয়া থাকে। পরমহংসের জীবন হৃদয়ঙ্গম করিতে হইলে, এই অংশ উপেক্ষা করিলে চলিবে না। যিনি তাঁহার ধর্ম্ম-জীবন লিখিয়া কৃতকার্য্য হইতে চাহেন, তাঁহাকে এই অংশের প্রতি সমুচিত সহৃদয়তা প্রকাশ করিতে হইবে। আমরা তাঁহার জীবনী লিখিতে

বসি নাই ; তাঁহার জীবন সম্বন্ধে সাধারণ ভাবে কয়েকটী কথামাত্র এস্থলে বলা অভিপ্রায়—দক্ষিণেশ্বরের কালীমন্দিরসহ তাঁহার জীবন সম্বন্ধ বিজড়িত—তাঁহার শয্যাসন পাদুকা এখনও দক্ষিণেশ্বরের মন্দিরে রক্ষিত। অথচ, পরমহংসের ভক্ত লেখক সম্প্রদায় যেন দক্ষিণেশ্বরের সম্পর্ক না করিয়াও তাঁহার জীবনী ধারণা করিতে সমর্থ বলিয়া মনে হয়। আমাদের ক্ষুদ্র বিবেচনায় তাঁহাদের লেখা এই অংশে অস্পষ্ট, অপূর্ণ ও মলিন।

দক্ষিণেশ্বর মন্দিরের স্থাপয়িত্রী রাণী রাসমণির পরে তাঁহার একতম দৌহিত্র ও উত্তরাধিকারী ৺মথুবাবাবুর পুত্র ত্রৈলোক্যনাথ বিশ্বাস মহাশয় আজীবন দক্ষিণেশ্বরের সেবাইতের কার্য্য চালাইয়া গিয়াছেন। পরমহংস-ঘটিত বহু কার্য্যই তাহার চক্ষের উপরে, তাঁহার কর্ত্তৃত্বের অধীন ও রক্ষণাবেক্ষণে ঘটিয়াছে ; তিনি পিতা ও মাতামহীর সহিত পরমহংস সম্বন্ধীয় বহু ঘটনাতেই স্বয়ং জড়িত ছিলেন, অনেক ঘটনা প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন এবং যাহা প্রত্যক্ষ করেন নাই, তাহাও তাঁহার জানিবার বিশেষ সুবিধা ও অধিকার ছিল। বলিতে কি পরমহংসঘটিত কোন কথাই তাঁহার অপরিজ্ঞাত ছিল না। তিনি যে ভাবে পরমহংস-সক্রান্ত ঘটনা বিবৃত করিয়াছেন, তাহা হইতেই পরমহংস দেবের বাহ্য জীবন সম্বন্ধে এইরূপ আভাষ প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে * :—

"গদাধর পূজারী কার্য্যে নিযুক্ত হইয়া, প্রথমতঃ কালীবাড়ীর ম্যানেজার, সহকারী ম্যানেজার প্রভৃতি মুনিববর্গকে তুষ্ট করিতে সমর্থ হন। সুন্দররূপে কালীপূজা ও শিবপূজাদি চলিতে লাগিল। শেষে গদাধরের ক্রটী বাহির হইতে লাগিল। পূজকের যেরূপ নিষ্ঠা নিয়ম থাকা আবশ্যক, তাহাতে তাঁহার ক্রটী দৃষ্ট হইতে লাগিল, পূর্ব্ববৎ যথানিয়মে পূজাগুলি তিনি

* নব্যভারত—৩০ খণ্ড ২য় ও ৩য় সংখ্যা।

নির্ব্বাহ করিতে শৈথিল্য করিতে লাগিলেন। যে পূজার জন্য এত আয়োজন, সেই পূজায় ব্যাঘাত পড়িতে লাগিল। ঠাকুরবাড়ীর কর্ম্মচারিগণ যার পর নাই ক্ষুব্ধ ক্রুদ্ধ ও দুঃখিত হইলেন। তাঁহারা গদাধরকে পূজারীর অযোগ্য স্থির করিলেন। তাঁহাদের ইচ্ছা হইল, উহাঁকে বহিষ্কৃত করিয়া দেন। পরিশেষে তাঁহারা সমস্ত বিষয় মথুরবাবুর নিকট পেশ করিলেন। তিনি সমস্ত বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া, গদাধরকে কোন প্রকারের সাধক শ্রেণীর লোক বলিয়া সন্দেহ করিলেন, তাড়াইয়া দিলেন না; তাঁহার দ্বারা কার্য্য চালাইয়া লইতে বলিলেন। অন্যের সাহায্যে কার্য্য একরূপ চলিল। রামকৃষ্ণের ভক্তগণ বলেন, তিনি প্রেম-বিহ্বলতাবশতঃ পূজাদি করিতে সমর্থ ছিলেন না। যাহা হউক, তাঁহার ব্যবহার সম্বন্ধে নানা অর্থই হইতে লাগিল। মথুরবাবু নিজে একজন সাধক লোক ছিলেন; রাণী রাসমণি বিশেষ চেতনাসম্পন্না নারী ছিলেন। তাঁহারা তাঁহার সমস্ত ত্রুটী মার্জ্জনা করিয়া, তাঁহাকে সমাদর করিতে লাগিলেন। কর্ম্মচারিগণ আর করিবেন কি? তাঁহাদের উভয়ের এইরূপ সমাদরের ভাব দেখিয়া গদাধরের বিপক্ষগণ নীরব হইলেন। গদাধর উত্তরোত্তর পূজাদি কার্য্যে সম্পূর্ণ অসমর্থ হইয়া পড়িলেন। তাঁহার নিকটে সাধুভাবাপন্ন লোক আসিয়া উপস্থিত হইতে লাগিলেন। অবশেষে মথুরবাবু পূজার জন্য অন্য বন্দোবস্ত করিয়া গদাধরকে জানবাজারের বাড়ীতে লইয়া গেলেন। সেই স্থানে তিনি কতক কাল বাস করিবার পর মথুরবাবু তাঁহাকে লইয়া তীর্থ পর্য্যটনে বহির্গত হইলেন। প্রায় অশীতিসহস্র মুদ্রা ব্যয়ান্তে তাঁহাকে লইয়া গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন ও স্বাধীনভাবে চলিবার অধিকার দান করিয়া দক্ষিণেশ্বরে রাখিয়া দিলেন।

"এই সমগ্রকাল ব্যাপিয়া তাঁহাকে কোন কঠোর ভজন, তপস্যা ইত্যাদি করিতে দেখা যায় নাই; ধ্যানকারী এবং উন্মত্তের ন্যায় আচরণ-

শীল দেখা গিয়াছে। তাঁহার মুখে গভীর জ্ঞানগর্ভ কথা শুনা গিয়াছে ও তাঁহাকে বহিঃসংজ্ঞা-রহিত হইতে দেখা গিয়াছে, এই সম্বন্ধে কর্ম্মপর মনুষ্যগণের ধারণা করা সহজ নহে। তবে মথুরবাবু ও রাণী রাসমণি স্বয়ং কতক অনুভব করিয়া এবং লোকের কাছে শুনিয়া তাঁহাকে বড় সাধক বলিয়া ভক্তি করিতেন। তাঁহাদের আশা ছিল, রামকৃষ্ণের প্রভাবে দক্ষিণেশ্বর জাগ্রত হইয়া উঠিবে। তাঁহারা রামকৃষ্ণের সাধনায় গুরু গম্ভীর কথায়, সমাধির ভাবে তাঁহাকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করিতেন ও ভাল বাসিতে লাগিলেন। মাতা যেমন শিশু পুত্রের শৌচাশৌচ, দোষাদোষ দর্শন করেন না, তাঁহাদের দৃষ্টিও রামকৃষ্ণের প্রতি সেইরূপ হইল। তাঁহারা তাঁহার কার্য্যে ত্রৈলোক্য বাবুর ন্যায় কঠোর কর্ম্মীর সমালোচনা-চক্ষে দৃষ্টি করিতেন না; করিলে গদাধরের পক্ষে দক্ষিণেশ্বরে সেইভাবে সাধনমার্গে চলা সহজ হইত কি না, বলিতে পারি না। এই সকল কথা চিন্তা করিলে মনে হয়, পরমহংস রামকৃষ্ণ নিজ সাধন ভজন জন্য, উন্নত জীবন লাভের জন্য, রাণী রাসমণি ও মথুরবাবুর নিকট কত ঋণী!! সে স্নেহ, সে কৃপা, সে শ্রদ্ধা ও মমতা, মহান্ উদারতা নিজ জনক জননীর নিকটেও তিনি পাইতেন না। এই সকল কথা তাঁহার জীবন চরিতে অতীব ম্লান, অতি অস্পষ্ট; যেন বিলুপ্তপ্রায় বলিয়া বোধ হয়।

"আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি কঠোরকর্ম্মী ত্রৈলোক্য বাবু পরমহংসের কার্য্য সমালোচনার চক্ষে দেখিতেন—সঙ্গেও কদাচ শ্রদ্ধাভক্তি প্রদর্শনে ত্রুটী করেন নাই। তিনি পরমহংসের ভক্তি জ্ঞান ও সমাধি প্রভৃতি গুণ দর্শন করিয়া অতীব ভক্তি করিতেন; কিন্তু অনুষ্ঠান অংশে তাঁহাকে বিশেষ সমালোচ্য মনে করিতেন। তাঁহার চক্ষে "যাহাকে রামকৃষ্ণ বলে সে কোন কোন বিষয়ে খুবই ভাল ছিল"।

ভারতবর্ষের কঠোরকর্ম্মী গৃহস্থ ও কর্ম্ম সন্ন্যাসী মধ্যে বৈষম্য চিরদিন

চলিয়া আসিতেছে। তবে যাঁহাদের কোন বিষয়ে নিষ্ঠা নাই, তাঁহারা খুব উদার হইতে পারেন, আর কিছু উদার হইতে পারেন জ্ঞানাভাস-সম্পন্ন ব্যক্তি। আভাসশীল হইতে দৃঢ়কর্ম্মনিষ্ঠ সাধু গৃহস্থকে হীন বলা যায় না। ত্রৈলোক্য বাবু এইরূপ দৃঢ় কর্ম্মনিষ্ঠ সাধু গৃহস্থ ছিলেন। রামকৃষ্ণ পরমহংস কি ভাবে প্রথমতঃ পূজারী পদে বৃত হইয়া, কি আকারের অনুষ্ঠান করিয়া উন্নত জীবনের অবস্থায় পৌঁহছিয়া ছিলেন, তাহার কিছু আভাস প্রদান করা হইল। তিনি একজন গরীবের সন্তান; দক্ষিণেশ্বরের মন্দিরে পূজারীর কার্য্যে নিযুক্ত হইবার পরেও কতক কাল পর্য্যন্ত অর্থাৎ যৌবনাবস্থার অনেক অংশ ব্যাপিয়া একজন কর্ম্মপর গৃহস্থ, কৃতদার ও জীবিকার্থী। তাঁহার জীবনে স্বাধীনভাবে তীর্থ-পর্য্যটন, কৃচ্ছ্র-সাধনা ও বৈরাগ্য-কঠোরতা লক্ষিত হয় না, অথচ যেন অকস্মাৎ বিকশিতজ্ঞান বা জাগ্রত বলিয়া প্রতীত হয়। এই জন্য অনেকে তাঁহাকে ভগবৎকৃপাসিদ্ধ বলেন। তিনি একবার বৃন্দাবন পর্য্যন্ত তীর্থ-পর্য্যটন করিয়াছিলেন, কিন্তু সে মথুরবাবুর স্নেহভক্তির শীতল ক্রোড়ে উঠিয়া—তাহাতে মথুরবাবুকে পর্য্যাপ্ত দান ও অর্থব্যয় করিতে হইয়াছিল। তিনি দক্ষিণেশ্বরের উদ্যানে যেন অবরুদ্ধ, বহু ভক্তজন কর্ত্তৃক সেবিত, পালিত ও রক্ষিত; তাঁহার শয্যাসন, পাদুকা দক্ষিণেশ্বরে প্রাসাদ-মন্দিরের এক নিভৃত কোণে সুরক্ষিত বটে, কিন্তু দর্শন করিলে মনে একটা বিষাদের ছায়া পতিত হয়। মনে হয়, উহা যেন গভীর বনের লতাগুল্ম-পরিবৃত হইয়া লোকলোচনের অন্তরালে নিহিত।

"রাণী রাসমণি একটা মহাশুদ্ধ পবিত্র প্রেরণায় পরমহংস রামকৃষ্ণের অদ্ভুত চরিত্রের বিকাশ ও প্রসারোপযোগী স্থান নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন আর তাঁহার প্রভাবশীল জামাতা মথুরবাবু ঐরূপ উচ্চ প্রেরণায় সেই দেবচরিত্র বিকাশের সময় অন্ত যাহা কিছু প্রয়োজন হইত, তৎসমুদায় যোগাইয়া

ছিলেন। মথুরবাবু ধনী অথচ উচ্চ প্রকৃতিসম্পন্ন, বিষয়ী হইলেও ভক্ত, হঠকারী হইলেও বুদ্ধিমান; ক্রোধপরায়ণ হইলেও ধৈর্য্যশীল এবং স্থির প্রতিজ্ঞ ছিলেন। তিনিও ইংরাজী ভাষাভিজ্ঞ—কিন্তু কোন কথা বুঝাইয়া দিতে পারিলে উহা বুঝিয়াও বুঝিব না এরূপ স্বভাবসম্পন্ন ছিলেন না; ঈশ্বর বিশ্বাসী ও ভক্ত—কিন্তু তাই বলিয়া ধর্ম্ম সম্বন্ধে যে যাহা বলিবে তাহাই যে চোক কাণ বুজিয়া অবিচারে গ্রহণ করিবেন তাহা ছিলেন না, তা তিনি ঠাকুরই হউন বা গুরুই হউন বা যে কেহ হউন; উদার প্রকৃতি ও সরল—কিন্তু তাই বলিয়া বিষয় কর্ম্মে বা অন্য কোন বিষয়ে যে মূর্খের মত ঠকিয়া আসিবেন তাহা ছিলেন না। বাস্তবিকই পুত্রহীনা রাণী রাসমণির অন্যান্য জামাতা বর্ত্তমান থাকিলেও বিষয় কর্ম্মের তত্ত্বাবধান ও সুবন্দোবস্ত করিতে কনিষ্ঠ মথুরবাবুই তাঁহার দক্ষিণ হস্তস্বরূপ ছিলেন এবং তাঁহারই বুদ্ধি-প্রাখর্য্যের সহায়তায় তৎকালে রাণী রাসমণির নামের অত দপদপা হইয়াছিল বোধ হয়। পরমহংস রামকৃষ্ণের ধর্ম্ম-জীবনও এই উচ্চপ্রকৃতি সম্পন্ন মথুরবাবু ও রাণী রাসমণির স্নেহ ভক্তির শীতল ছায়ায় পালিত ও রক্ষিত হইয়াছিল।



সপ্তম পরিচ্ছেদ।

রাণীর শেষ জীবন।

কালীমন্দির নির্ম্মাণ ও প্রতিষ্ঠার পর রাণী যত দিন জীবিত ছিলেন, ধর্ম্মকর্ম্ম পূজাচর্চ্চাদিতে পবিত্রভাবে অতিবাহিত করিয়াছিলেন। শৈশবেব সেই ধর্ম্মাচরণ-প্রিয়তা, সেই পরোপকার-ব্রত আমরণ তাঁহাব পবিত্র জীবনে পরিলক্ষিত হইয়াছিল। পুণ্যবতী রাণী শেষ জীবনে খুব কমই জান-বাজারে থাকিতেন, অধিকাংশ দিনই সপরিবারে দক্ষিণেশ্বরে কাটাইতেন। তিনি রামকৃষ্ণ দেবকে বিশেষ ভক্তি করিতেন এবং দক্ষিণেশ্বরে গেলেই তাঁহার নিকট বসিয়া ধর্ম্মচর্চ্চা, ভগবৎপ্রসঙ্গ ও সাধনভজন সম্বন্ধে কথা বার্ত্তা কহিতেন।

রামকৃষ্ণদেব যে প্রাণের উচ্ছ্বাসে মধুর কণ্ঠে গান করিতেন, সে গান একবার যে শুনিত সে আর ভুলিতে পারিত না। তাহাতে ওস্তাদি কালোয়াতি ঢং ঢাং কিছুই ছিল না; ছিল কেবল, গীতোক্ত বিষয়ের ভাবটী আপনাতে সম্পূর্ণ আরোপ করিয়া মর্ম্মস্পর্শী মধুরস্বরে ঐ ভাবের যথাযথ প্রকাশ ও তানলয়ের বিশুদ্ধতা। ভাবই যে সঙ্গীতের প্রাণস্বরূপ, একথা—যে তাঁহার গান শুনিয়াছে সেই বুঝিয়াছে। আবার তান লয় বিশুদ্ধ না হইলে ঐ ভাবই যে আত্মপ্রকাশে বাধা পাইয়া থাকে, একথাও তাঁহার মুখনিঃসৃত সঙ্গীত শুনিয়া এবং অপরের সঙ্গীতের সহিত তুলনা করিয়া বেশ বুঝা যাইত। রাণী রাসমণি যখনই দক্ষিণেশ্বরে যাইতেন তখনই রামকৃষ্ণ দেবের গান শুনিতেন। নিম্নলিখিত গানটী তাঁহার প্রিয় ছিল :—

"কোন্ হিসাবে হরহৃদে দাঁড়িয়েছ মা পদ দিয়ে।
সাধ ক'রে জিব বাড়ায়েছ, যেন কত ন্যাকা মেয়ে॥
জেনেছি জেনেছি তারা
তারা কি তোর এমনি ধারা,
তোর মা কি তোর বাপের বুকে দাঁড়িয়েছিল অম্‌নি ক'রে॥"

গান শুনিতে শুনিতে রাণী বালিকার ন্যায় অশ্রু-বিসর্জ্জন করিতেন। রামকৃষ্ণ দেব রাণীকে কালী মাতার অষ্টসখীর অন্যতম সখী বলিতেন।

দক্ষিণেশ্বরে নবরত্ন-মন্দির নির্ম্মাণের পূর্ব্বে রাণী কালীঘাটে একটী বাগান, বাটী, পুষ্করিণী ও আদিগঙ্গায় স্নান করিতে যাইবার ইষ্টক-নির্ম্মিত সোপানাবলী প্রস্তুত করাইয়াছিলেন। পূর্ব্বে এই স্থানেই কালী প্রতিমার পূজা, উৎসব, ব্রাহ্মণ ও অন্যান্য সকলকে ভোজন ও দান করা হইত। দক্ষিণেশ্বরে কালীপ্রতিষ্ঠার পর হইতে কালীঘাটের উৎসব বন্ধ হয়—দক্ষিণেশ্বরেই মহাধূমধামে কালীমাতার পূজাদি হইতে থাকে।

দরিদ্রের ঘরে জন্মগ্রহণ করিয়া অপার ঐশ্বর্য্যশালীর পত্নী ও অনন্ত-বৈভবের অধিকারিণী হইলেও তিনি শৈশবস্মৃতি একদিনের তরে ভুলিয়া যান নাই। পুণ্যবতী আর্য্য বিধবা দানধর্ম্ম তীর্থ-পর্য্যটনে ও দেবসেবায় তাঁহার অনন্ত বৈভব জলস্রোতের ন্যায় ব্যয় করিয়া যেমন সুনাম অর্জ্জন করিয়াছিলেন, তেমনই আবার গৃহধর্ম্মে পাকা গৃহিণীপণা করিয়া সংসার পরিচালনে আদর্শণীয়া ছিলেন। দাসদাসী লোকজন আত্মীয়কুটুম্ব কন্যা জামাতা দৌহিত্রদৌহিত্রীগণে পরিবৃত থাকিয়া সোণার সংসারে রাণী গিরি করিয়া অতুলনীয় অমায়িকতা বদান্যতা ও দয়াপ্রকাশের জাজ্বল্য দৃষ্টান্ত প্রকটিত রাখিয়া গিয়াছেন।

কাশীযাত্রার উদ্যোগ করিয়া যাওয়া হইল না বলিয়া রাণী বিশেষ দুঃখিতা ছিলেন না বটে, তথাপি কাশীতে একটী শিবমন্দির স্থাপনের জন্য তাঁহার সঙ্কল্প ছিল, তজ্জন্য কিয়ৎ পরিমাণ ভূমিও তথায় সংগ্রহ করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার জীবদ্দশায় তথায় মন্দির স্থাপিত হয় নাই। তাঁহার অন্যতম দৌহিত্র ও দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়ীর পরবর্ত্তী সেবাইত ত্রৈলোক্যবাবু কাশীতে রাণীর সংকল্প মত 'ত্রৈলোক্যেশ্বর' শিবলিঙ্গ স্থাপন পূর্ব্বক একটী মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়া দিয়াছেন।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

কালীঘাটে রাণীর স্বর্গারোহণ।

কয়েক মাস হইতে রাণী উদরাময় রোগে ভুগিতেছিলেন, ক্রমে উহা কঠিন আকার ধারণ করিল। রাণী শয্যাগ্রহণ করিলেন। ডাক্তার কবিরাজ সকলেই হতাশ হইল। শেষ রাণীকে স্বাস্থ্যকর স্থানে জলবায়ুর পরিবর্ত্তন করিতে উপদেশ দেওয়া হইল। অনেকানেক স্থান নির্দ্দেশ করা হইল, কিন্তু রাণী দক্ষিণেশ্বর কিংবা কালীঘাট এই দুই স্থানের এক স্থানে থাকিবার বিষয় নিজেই স্থির করিলেন। কালীঘাটেই থাকা মত হইল। চিকিৎসায় বিশেষ কোন প্রতীকার হইল না। ১২৬৭ সাল ৯ই ফাল্গুন বুধবার দিনও কাটিল বটে, কিন্তু রাত্রি বুঝি কাটিল না। কি হয় কি হয়, একটা দুর্ভাবনা সকলেরই মনে উদয় হইতে লাগিল। শেষ রাত্রি ৮ ঘটিকার সময় কালীমাতার অর্ঘ্য, গুরু পুরোহিত সকলের পদধূলি শিরে লইয়া ও আর আর সকলকে আশীর্ব্বাদ করিয়া তিনি রাজচন্দ্র বাবুর সহিত পরলোকে মিলিত হইলেন। সকলেই কাঁদিতে লাগিল, সে কথা বলা বাহুল্য। ক্ষিত্যপ্‌তেজোমরুদ্ব্যোম্‌” পঞ্চভূত পঞ্চভূতে মিশাইল। তিন জামাতা, তিন কন্যা, ১৫।১৬ জন দৌহিত্রদৌহিত্রী, দাসদাসী দ্বারবান কর্ম্মচারী সকলকে কাঁদাইয়া রাণী পৃথিবী হইতে চির অবসর লইলেন। রাণীর মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই কালীঘাটেই আদিগঙ্গার তীরে “কেওড়া তলার” ঘাটে শবদাহ জন্য চন্দনকাষ্ঠের

চিতা প্রস্তুত হইল। লোকজন সকলেই রাণীর শবদেহ বহুমূল্য চীনাংশুক ও কৌষেয় বস্ত্র আবৃত করিয়া রৌপ্য-তাম্র-মুদ্রাসহ লাজাঞ্জলি পথে বিতরণ করিতে করিতে লইয়া গিয়া চিতায় সমর্পণ করিলেন। সর্ব্বভূক্ ধূ ধূ শব্দে স্বল্পকাল মধ্যেই রাণীর দেহ গ্রাস করিল।

বাঙ্গালী রমণীকুলের মণি, আদর্শণীয়া পুণ্যবতী রাণী রাসমণি জীবন-সংগ্রামে জীবনের মহাব্রত উদ্‌যাপনে জীবনের বিন্দু বিন্দু ব্যয় করিয়া অনন্তধামে মহাপ্রস্থান করিলেন! কন্যা-জামাতা দৌহিত্র, দৌহিত্রী প্রভৃতি বহুসংখ্যক আত্মীয় স্বজনেব সেবা ও সমাদরে জীবনের শেষ মুহূর্ত্তেও সজ্ঞানে সকলের অশ্রুধারা সিক্ত হইয়া চিববিদায় গ্রহণ করিলেন!

রাণী গৃহস্থালীতে গৃহলক্ষ্মী রূপা, অতিথি সেবায় অন্নপূর্ণা স্বরূপা, দাসদাসীদের পক্ষে জননীস্বরূপা, পতিপ্রাণাদিগের মধ্যে কাত্যায়নী রূপা, সুন্দরীদিগের মধ্যে শ্রীরূপা, জননীদিগের মধ্যে গণেশজননী সমা, কন্যাদিগের মধ্যে একাধারে পিতৃমাতৃসমা, জামাতাদিগের পক্ষে অভিভাবক স্বরূপা, প্রজাদের পক্ষে করুণাময়ী, আর্ত্তদের পক্ষে দানশীলা ছিলেন। অর্থের সদ্ব্যয় করিয়াছেন বলিয়া বলিতেছি না; অনেকেরই অর্থ আছে, কয়টি ধনকুবের কত গুলি টাকা এককালীন দেশের উপকারের জন্য ব্যয় করিয়াছেন? অল্প মাত্রায় যাঁহারা করিয়াছেন তাঁহারা নামের জন্যই করিয়াছেন। রাণী নামের জন্য করেন নাই। তাঁহার জন্য কেহ কোন তৈলচিত্র, প্রভাচিত্র বা প্রস্তর-খোদিত মূর্ত্তিও করেন নাই, তবে বহু স্থানে তাহার কীর্ত্তি তাঁহার নাম ও মূর্ত্তি জাগাইয়া রাখিয়াছে। রাণীকে শোক পাইতে হইয়াছে যেমন, আনন্দও পাইতে হইয়াছে তেমন। কৃতী না হইলে জগতের উপকার সাধন করিবার ইচ্ছা না থাকিলে তিনি ধনী ব্যক্তির মত কোন তীর্থে

বাস করিয়া জীবন যাপন করিতে পারিতেন। কিন্তু তিনি দশের জন্ম দেশের জন্য, দুঃখীর জন্য, আর্ত্তের জন্য জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন।

ভগবান আশীর্ব্বাদ করুন, যেন এই রাণী রাসমণির পুণ্যময়ী জীবন-কাহিনী পাঠ করিয়া বাঙ্গালী নরনারী নিষ্ঠার সহিত কর্ত্তব্যসাধন, অধ্যবসায়, বীরোচিত গুণাবলীর অনুকরণে প্রবৃত্তি, ঐশ্বর্য্যভোগ ও সাধনার শিক্ষা করিয়া জাতীয় জীবন গঠনে সহায়তা লাভ করেন।

সম্পূর্ণ।

